
DIPSIKHA LIBRARY
ESTD-1943
Dist-Howrah
Vill-Kastosangrah


Dist.

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২।।৹

—দুই টাকা—

প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৪৫

দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্ত্তিক, ১৩৪৮

তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৫২

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, এবং কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫, ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

সহপাঠী সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বর্ধন

এম্-বি, এফ্-আর্-সি-পি, এফ্-আর্-সি-এস্

মেজর, আই-এম্-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত)

প্রিয়বর-করকমলে ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দীপাবলী,

১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ।



প্রকাশকের নিবেদন

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচিত কতকগুলি প্রবন্ধ বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুরোধে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নির্বাচিত কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া পুনঃপ্রকাশে সম্মত হওয়ায়, আমরা এই পুস্তকে তাঁহার সাতটী প্রবন্ধ একত্র গ্রথিত করিয়া মুদ্রিত করিলাম। আশা করি প্রথম প্রকাশের সময়ে প্রবন্ধগুলি সাধারণ্যে যেরূপ আদর পাইয়াছিল, এখনও সুধীগণ-সমক্ষে এগুলির সেই আদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইতি।

বিনীত

প্রকাশক

বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল।

প্রথম সংস্করণ বইগুলি নিঃশেষিত হওয়ায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে দুই একটী শব্দের পরিবর্ত্তন ও সামান্য দুই একটী সংশোধন ভিন্ন আর কোনও পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

কার্ত্তিক, ১৩৩৮ সাল।　　　　প্রকাশক।

—সূচীপত্র—



জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে দুই চারিটী কথা নিবেদন করিতে চাহি।

"বাঙ্গালী জাতি" বলিলে, যে জন-সমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জন-সমষ্টিকে বুঝি। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে, দেশের জল-বায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই "বাঙ্গালী সংস্কৃতি"। এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে-সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই "বাঙ্গালা সাহিত্য"।

এখন পাঁচ কোটির অধিক লোকে বাঙ্গালা ভাষা বলে। সংখ্যা-হিসাবে বাঙ্গালী জাতি নগণ্য নহে। গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী—ইহাদের প্রত্যেকের অধিবাসিগণের চেয়ে বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী

জনগণের সংখ্যা অধিক। আমি এই বিষয়ে আমার দেশবাসিগণের ও অন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসাবে বাঙ্গালা বলে। হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দূ) ভাষার স্থান অবশ্য ভারতবর্ষে বাঙ্গালার উপরে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; হিন্দুস্থানী বাঙ্গালার তিন গুণের কাছাকাছি লোকের মধ্যে প্রচলিত, এবং আরও অনেকে ইহা বলিতে পারে; কিন্তু হিন্দুস্থানী উত্তর-ভারতের অর্থাৎ আর্য-ভাষী ভারতের চৌদ্দ কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, ইহা (অর্থাৎ হিন্দী-উর্দূ সমেত পশ্চিমা-হিন্দী উপভাষাগুলি) মাত্র সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষা—বাকী সাড়ে নয় বা দশ কোটি লোক ঘরে লহন্দী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, মালবী, গাঢ়বালী, কুমাউনী, অবধী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরিয়া, মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে; এই সব ভাষা হিন্দুস্থানী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র;—এই সব ভাষা যাহারা ঘরে বলে, তাহাদের কাহাকেও হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উর্দূ) শিখিতে হইলে, দস্তুর-মত চেষ্টা করিয়া, অনেকটা বিদেশী ভাষা শিক্ষার মত করিয়াই শিখিতে হয়। পৃথিবীর সংখ্য-গরিষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্থান সপ্তম। বাঙ্গালার অগ্রে এই কয়টী ভাষার নাম করিতে হয়—উত্তর-চীনা, ইংরেজী, রুষ, জরমান, স্পানিশ, জাপানী; পরে বাঙ্গালা। কিছুকাল হইল, Benn's Six-penny Library নামক সুপরিচিত এবং প্রামাণিক গ্রন্থমালা-মধ্যে Firth নামক একজন ইংরেজ ভাষা-তত্ত্ববিৎ ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন; এই পুস্তকে তিনি সংখ্যার দিক্ বিচার করিয়া এবং অন্য বিষয়ে লক্ষণীয়ত্ব বিচার করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়াছেন। অবশ্য, কেবল অন্যতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভাষা হওয়ায় বাঙ্গালার বা আর কোনও ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কিছু নাই; কিন্তু সংখ্যাধিক্য উপেক্ষণীয় বস্তু নহে;

এবং সংখ্যাধিক্য ভিন্ন, বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবও অন্য পাঁচটী ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার একটী প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে।

এই যে পাঁচ কোটি বাঙ্গালা-ভাষী যাহারা সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া এবং বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ জুড়িয়া বাস করিতেছে, এবং কিছু কিছু বাঙ্গালার বাহিরে অ-বাঙ্গালীদের দেশে গিয়াও যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পরের মধ্যে একটা ভাষা-গত স্বাজাত্য অনুভব করে। বিদেশে অন্য-ভাষা-ভাষীদের মধ্যে গেলে, এই স্বাজাত্য-বোধটুকু আমাদের কাছে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হয়। আজ-কাল জাতীয়তা বা স্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা। যেখানে বিভিন্ন ভাষা, সেখানে ধর্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থান এক হইলেও, সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া কঠিন,—সম্পূর্ণাঙ্গ স্বাজাত্য-বোধ আসা এক রকম অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে এমন একাধিক জন-সমষ্টিকে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কারণে একরাজ্য-পাশে বদ্ধ করা যায়; কিন্তু দেখা যায়, ভাষা-গত বৈষম্য থাকিলে, ওতপ্রোত-ভাবে মিল হয় না। রাষ্ট্রীয় বন্ধনে সঙ্ঘ-বদ্ধ বিবিধ-ভাষা-ভাষী একাধিক জন-সমষ্টির মধ্যে একটী বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা স্বরূপ গ্রহণ করিলে, একতার সূত্র একটা অধিক হয় বটে, কিন্তু প্রান্তিক সত্তা বর্জন করিয়া সকলে মিলিত হইতে চাহে না বা পারে না। সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে, দেশে মাত্র একটী ভাষাকে রাখিতে হয়,—অন্যগুলিকে হয় একে বারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা নির্জীব ও ক্ষয়িষ্ণু করিয়া রাখিতে হয়। এই রূপটি করিয়াই তবে গ্রেট ব্রিটেনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঘটিয়াছে—স্কটলাণ্ডের গেলিক ও ওয়েল্‌স্-এর ওয়েল্‌শ্-ভাষাকে বিলোপের পথে আগাইয়া দিয়া ইংরেজীর প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া

ব্রিটিশ ঐকতা। ফ্রান্সেও এইরূপে দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভঁাসাল ভাষাকে নির্জীব ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রেতঁ ভাষাকে ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প করিয়া, ফরাসী ভাষায় অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার আসনেই ফ্রান্সের রাষ্ট্র-গত একতা স্থাপিত হইয়াছে। বহুভাষাময় রুষ সাম্রাজ্যেও এই প্রকারে প্রান্তিক ভাষাগুলিকে পিষ্ট ও বিনষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়,—এক সময়ে রাজভাষা রুষের চাপে পোলীয় ভাষা, লিথুআনীয়, লেট্, এস্তোনীয়, ফিন্, আর্মানী প্রভৃতি ভাষার প্রাণসংশয় হইয়াছিল; কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যের পতন ও উক্ত সাম্রাজ্যের খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল ভাষা যাহারা বলে তাহারা মাথা-কাড়া দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, নিজ নিজ ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ঐক্যের প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া, কেহ-কেহ হয় তো এগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ও ইহাদের স্থানে একমাত্র হিন্দীর অবস্থান কামনা করিবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার সাধন করা অসম্ভব—এক কোটি, দুই কোটি, পাঁচ কোটি লোকের ভাষাকে এ ভাবে মারা যায় না। বিশেষতঃ প্রান্তিক জনগণ যেখানে পৃথক্ প্রান্তিক সত্তা সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে এরূপ কল্পনা করাও যায় না।

এই প্রান্তিক সত্তার প্রাণই হইতেছে—প্রান্তিক ভাষা। এই জন্য বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা মানিয়া লইয়া, সম্পূর্ণ রূপে একীভূত রাষ্ট্রের পরিবর্তে, রাষ্ট্র সঙ্ঘের গঠনকেই আদর্শ ধরিতে হয়। সোভিয়েট-শাসিত রুষ-দেশে এইরূপ হইয়াছে—রুষ সাম্রাজ্যের তাবৎ ভাষাকে এখন নিজ নিজ গৃহে স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া সমগ্র দেশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষেও দাঁড়াইতেছে তাহাই। The United States of India, অর্থাৎ 'ভারতবর্ষের সংযুক্ত

রাষ্ট্র'—ইহাই হইতেছে ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কংগ্রেস ভারতকে বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল, বিহার, হিন্দুস্থান বা সংযুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থানী মধ্য-প্রদেশ, মহাকোশল, মারাঠি মধ্য-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিল-নাড়ু, কেরল, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষা-গত প্রদেশে বিভাগ করিয়াছেন। এক একটী প্রদেশে এক একটী ভাষা, এক একটী ভাষা অবলম্বন করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র জাতি; সকলেই বৃহত্তর বৃত্ত-স্বরূপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সার্বভৌম ভারতীয় সত্তা বা সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দী ভাষাকে "রাষ্ট্র-ভাষা" বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া গিয়াছে; সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য ও অনপনেয় সম্মিলনে আধুনিক কালের এক অখণ্ড ভারত-বর্ষের প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে, ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেই সব বিষয়ে বাঙ্গালীদের সমতা আছে। বিশেষের উপরে ঝোঁক দিয়া সাধারণকে ভুলিলে চলিবে না—সাধারণটাই যখন প্রধান। ভারতের সমস্ত-প্রদেশ-সুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙ্গালাও তাহার অংশীদার। অন্য দেশের সমক্ষে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে বিদ্যমান এই ভারতীয়ত্বটুকু, ঈষৎ-পরিবর্তিত বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপে তত্তৎ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যের পর্যায়েই পড়ে। একটী বাহ্য ও সহজ ব্যাপারেই এইটী দেখা যায়।

আমাদের চেহারায় একটা সাধারণ অনন্যদেশ-লভ্য ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছে; অন্য দেশের মানুষের তুলনায়, আমাদের দেশের যে কোনও প্রদেশের মানুষের মধ্যে এই জিনিষটী পাওয়া যায়। গায়ের গৌর-বর্ণে, কিংবা শ্যাম-বর্ণে, মুখ চোখের সমাবেশে, চাহনিতে, চলনে বলনে, এমন একটা লক্ষণীয় জিনিস আছে, যাহা কেবল ভারতবর্ষেই পরিচায়ক। অত্যন্ত গৌরবর্ণ পারসী অথবা কাশ্মীরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী, খুব খাটো চেহারার এবং খুব কালো রঙ্গের সাঁওতাল, প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় জন-সঙ্ঘের মধ্যে কতকগুলি extreme type অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিলে, যে কোনও প্রদেশ হইতে হউক না কেন, সাধারণ ভারতবাসী জনকতককে ধরিয়া, তাহাদের দেহ হইতে কানের মাকড়ী, লম্বা চুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির ঘটা, মুসলমানী কায়দায় ছাঁটা গোঁফ, প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছনা দূর করিয়া দিয়া, এক রকমের কাপড় চোপড় পরাইয়া দিলে, তাহারা কোন্ প্রদেশের লোক তাহা বলা কঠিন হইবে। ইউরোপে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ জিনিস দেখিয়াছি, আমার মত অনেকেও দেখিয়াছেন; এদেশেও লোকে অহরহঃ দেখিতেছে। ইংরেজী-পোশাক-পরা সাধারণ ভারতীয় মানুষকে, যদি বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার বাহিরে, রেলে বা অন্যত্র দেখি, তাহা হইলে জোর করিয়া বলা কঠিন হয়—লোকটী কোন্ প্রদেশের; লোকটী বাঙ্গালী হইতে পারে, না-ও হইতে পারে, এ বোধও আমাদের আসে। আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি—বাঙ্গালী ভারতীয়ই বটে। বাঙ্গালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয় তো চার আনা ইউরোপীয়,—তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,—এবং আট আনা ভারতীয়; বাকী চার আনায় সে বাঙ্গালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের

বাঙ্গালা বিকারমাত্র,—বাকীটুকু খাঁটী বাঙ্গালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির এক অংশে আবার ইস্‌লামের প্রভাব আছে—সে প্রভাব কতটা আছে, তাহার নির্ণয় বাঙ্গালী মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই করিবেন; তবে তাহা খুব বেশী নহে; এ বিষয় লইয়া পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এতটা কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী জাতির কথা, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, এই সব জিনিসের ভারতীয় আধার বা পটভূমিকার কথা বাদ দিলে চলিবে না। অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক আক্রমণের চাপে আমরা মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছি; ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ঘরের মুসলমানের চাপও আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দুদের উপর অনুচিত ও অন্যায় ভাবে এখন আসিয়া পড়িতেছে—ইংরেজানুগৃহীত মুসলমানের এখনকার এই দাপট, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেরই হানিকর হইবে। কতকটা দিশাহারা হইয়া আমাদের এক দল উপদেশ দিতেছেন—"সামাল, সামাল, এটা আপদের সময়; কর্মঠ-ব্রত বা কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালীয়ানার খোলার ভিতরে হাত পা গুটাইয়া লইয়া ব'সো, বাঁচিয়া যাইবে; 'ভারত' 'ভারত' বলিয়া চেঁচাইও না। বলো, 'বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়ের মা বঙ্গ-মাতার জয়'; Sinn Fein অর্থাৎ We Ourselves এই মন্ত্র জপ করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতের অর্থনৈতিক উপদ্রব ও শোষণ হইতে বাঁচ; এবং সম্ভব হইলে, এই মন্ত্র আওড়াইয়াই আরব তথা উর্দু ওয়ালা পশ্চিমা মুসলমানদের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আক্রমণ হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদেরও বাঁচাও,—তাহারা খাঁটী বাঙ্গালী থাকিলে, বাঙ্গালী হিন্দু, তুমিও বাঁচিয়া যাইবে।"

কথাটা খুবই সমীচীন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার। Confusion of issues অর্থাৎ বিষয়-বিভ্রম যাহাতে না ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালার বুকের ভিতরে যে বৃহত্তর মারওয়াড়, বৃহত্তর উৎকল, বৃহত্তর সংযুক্ত প্রদেশ, বৃহত্তর পাঞ্জাব, বৃহত্তর ভাটিয়া ভূমি, বৃহত্তর বিহার, বৃহত্তর অন্ধ্র, বৃহত্তর কেরল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাণপণে সে সকলের অর্থনৈতিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে, এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ আছে সেই যোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রয়োগ করিয়া, অর্থনৈতিক দিকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাইতেছে, মুখের গ্রাসটা কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের বাধা দিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে বাঙ্গালার সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, তাহা ভুলিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করিব,—কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগ ভুলিব না; নূতন সাংস্কৃতিক যোগের সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিব না; এবং আমাদের অতীতের কথার আলোচনা কালে, আমাদের জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাঙ্গালার পটভূমিকা নিখিল ভারতবর্ষকে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইব না। বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুয়া মদিনা ও কমলার চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব করিব-ই,—এই অপূর্ব নারীচরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালারই পল্লী-জীবনের সৃষ্টি; কিন্তু উমা সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরব করিব না; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সীতা সাবিত্রী বাঙ্গালার

বিশেষকে অতিক্রম করিয়া, বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হইয়া, বাঙ্গালীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক হইয়া বিরাজ করিতেছেন ;—আদি আর্য-ভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই থাকে না, তেমনি সীতা-সাবিত্রীকে অর্থাৎ আদি আর্য-যুগের বা সংস্কৃত যুগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে বাদ দিলে, বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের কল্পনা করিতে পারি না। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতা-সাবিত্রীকে "ঘাঘরা-পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া, বাঙ্গালার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন, বা হৃদয়-সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন ; তাঁহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা-পল্লী-গাথাবলীর নায়িকা মলুয়া মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতা-সাবিত্রীর সত্যকার পোশাক যাহাই থাকুক (তবে প্রাচীন আর্য যুগে মেয়েরা যে ঘাঘরা পরিত না, এবিষয়ে সন্দেহ নাই), বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্য মুহূর্তে পাদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙ্গালী ধরণের সাড়ী পরাইয়া দিয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। রায় বাহাদুরের এই চেষ্টার বিশ্লেষণ এখন করিব না ; কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটী শব্দ দ্বারা এই চেষ্টার বর্ণনা করা যায়— সে শব্দটী হইতেছে "আদিখ্যেতা"—অর্থাৎ, বিশেষ এক প্রকার ভাব-বিলাসের আতিশয্য ; এবং এই চেষ্টার মূলে, অন্যান্য মনোভাব ও চিন্তা ব্যতীত এই জিনিসটী দেখিতে পাই—আমাদের বাঙ্গালার জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা আধার-ভূমি কি কি বিষয় লইয়া, তৎসম্বন্ধে অবহিত না হইয়া, নূতন ও অনপেক্ষিত কথা (তাহা যুক্তি-সহ হউক বা না হউক) বলিয়া, sensationalism বা চমক-প্রদতার সৃষ্টি করা। বঙ্গদেশ

তুর্কীদের দ্বারা বিজিত না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যই গড়িয়া উঠিত না—ইহাও এই রূপই sensational এবং যুক্তি-হীন কথা।

ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না ; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে, জাতীয়তা-বোধও আসে না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি লইয়া অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির কথা পুনরুদ্ধার করা যায়, সেগুলি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা এখন হইতে মাত্র হাজার বৎসর পূর্বে নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পূর্বে বাঙ্গালা সৃজ্যমান, তখন বঙ্গদেশের ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ হিমাচল কন্যা গঙ্গার দান ; পলিমাটিতেই বাঙ্গালার উদ্ভব। বাঙ্গালা দেশের ভাষাও তেমনি উত্তর-ভারতে উদ্ভূত আর্যভাষা প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন। গঙ্গার মত আর্য-ভাষার নদী বাঙ্গালা দেশেও বহিল, এই নদীর স্রোতে দেশের প্রাচীন অনার্য ভাষা ভাসিয়া গেল—আর্য ভাষা প্রাকৃত, এই বাঙ্গালায় আসিয়া, ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিল ; প্রাকৃতের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ধাত্রী-রূপে সংস্কৃতও আসিল।

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি-পর্ব একটু সংক্ষেপে শেষ করিয়া, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিব।

প্রাগৈতিহাসিক কালে বাঙ্গালার অধিবাসীরা কি প্রকারের মানুষ ছিল, তাহা জানা অসম্ভব ; তবে এইটুকু অনুমান হয় যে, যে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পূর্ব-পুরুষেরাই বাস করিয়া আসিতেছে। উত্তর ভারতের লোকেরা বিহার ও আরও পশ্চিম হইতে বরাবর-ই বাঙ্গালা দেশে কিছু-কিছু করিয়া আসিয়াছে—এখনও যেমন

আসিতেছে। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালাদেশের লোকেদের প্রকৃতি বা আকৃতি বিশেষ কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে কি না, জানা যায় না। নৃতত্ত্ব-বিদ্যা বাঙ্গালা-দেশের অধিবাসীদের কুলজী বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও স্পষ্ট কিছু বুঝা যাইতেছে না। এ বিষয়ে আমি যাহা বলিব, তাহা মুখ্যত-ই ভাষার দিক হইতে অনুমান করিয়াই বলিব। ভাষা-তত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে আর্য ভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত। মনে হয় পাঁচটী জাতির বা পাঁচটী বিভিন্ন প্রকারের ভাষা বলিত এমন লোকেদের মিশ্রণে উত্তর-ভারতের নানা জনগণের উদ্ভব হইয়াছে; সেই পাঁচটী জাতি হইতেছে—[১] Negroid নিগ্রোরূপ বা Negrito নেগ্রিটো, [২] Austric অস্ট্রিক, [৩] দ্রাবিড়, [৪] আর্য, এবং [৫] Sino Tibetan বা Tibeto-Chinese অর্থাৎ ভোট-চীন। অনুমান হয়, আদিম যুগে, যখন মানুষ আদিম কালের বা প্রথম কালের অমসৃণ প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহার করিত, তখন ভারতের অনাদি অরণ্য-সমূহে, বিশেষ করিয়া ভারতের সমুদ্র-তীরবর্তী স্থান-সমূহে, ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, ঊর্ণাবৎ-কেশযুক্ত নিগ্রো-সম্পৃক্ত নেগ্রিটো বা 'নিগ্রোবটু' জাতির মানুষ বাস করিত। ইহা এখন হইতে কম করিয়া ধরিলেও পাঁচ ছয় হাজার বছর পূর্বেকার কথা। শিকার-লব্ধ মাংস, বন্য কন্দ-মূল এবং মৎস্য ইহাদের আহার ছিল, কৃষি-কার্য ইহারা জানিত না, এবং ইহাদের সভ্যতায় কোনও বালাই ছিল না। ইতিমধ্যে Indo-China ইন্দোচীন হইতে অস্ট্রিক জাতির লোকেরা আসামের উপত্যকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে। অস্ট্রিক জাতির মূল ভাষা, ও মূল অস্ট্রিক জাতি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, উত্তর-ইন্দোচীনের কোনও স্থানে, এইরূপ অনুমিত হয়। অস্ট্রিক জাতি একটী লক্ষণীয় সভ্যতার পত্তন করে। অস্ট্রিক জাতির আকৃতি ও প্রকৃতি কি

প্রকার ছিল, তাহা বলা যায় না ; ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিৎ Przyluski প্‌শিলুস্কি অনুমান করিয়াছেন, তাহারা পীতাভ-বর্ণ ছিল, তাহারা কতকটা মোঙ্গোল জাতির মতন দেখিতে ছিল। ইহাদের বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রসৃত হয় ; দক্ষিণের দেশে গিয়া ইহারা সেখানকার আদিম জাতিদের সহিত মিলিত হয়, ও সেখানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া ইহারা মালয় বা Indonesian ইন্দোনেসীয় জাতিতে, এবং পরে প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়া আরও মিশ্রণের ফলে Melanesian মেলানেসীয় ও Polynesian পলিনেসীয় জাতিতে রূপান্তরিত হয়। ইহাদের কতকগুলি দল ইন্দোচীনেই রহিয়া যায় ; তাহাদের উত্তর পুরুষ হইতেছে দক্ষিণ-বর্মা ও শ্যামের Mon মোন্ বা Talaing তালৈঙ্‌ জাতি এবং কম্বোজের Khmer খ্‌মের্ জাতি, এবং ব্রহ্ম, শ্যাম ও ফরাসী ইন্দো-চীনের কতকগুলি অর্ধ-বর্বর জাতি। ইহাদের একটী শাখা নিকোবার-দ্বীপে উপনিবিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে খুব সম্ভবতঃ ইহারা অল্প-বিস্তর আদিম নিগ্রোবটুদের সহিত মিলিত হয়, নিগ্রোবটু ও অস্ট্রিকের রক্তে মিশ্রণ ঘটে ; এই সংমিশ্রণের ফলে Kol কোল বা Munda মুণ্ডা জাতির উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। আবার কোথাও এই মিশ্রণ প্রায় হয়-ই নাই, যেমন খাসিয়াদের মধ্যে।

Hevesy হেভেশি নামে একজন হঙ্গেরীয় পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করিতেছেন যে, Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয় জাতির একটী শাখা সাইবেরিয়া হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে আইসে, এবং তাহাদের আনীত ভাষাই স্থানীয় অন্য ভাষার প্রভাবে পড়িয়া কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয়। হেভেশি কোল ভাষার সহিত অস্ট্রিক ভাষার যোগ অস্বীকার করেন। হেভেশির মতের এখন বিচার চলিতেছে—ইহাতে সকলে এখনও সায় দেন নাই।

ভারতের বহুস্থলে নিগ্রোবটুদের বিলোপ ঘটিয়াছিল। আসামের পার্বত্য অঞ্চলের কোনও-কোনও স্থানে, দক্ষিণ-ভারতের দুই-একটী বন্য জাতির মধ্যে, এবং দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে, এই নিগ্রোবটুর অস্তিত্বের নিদর্শন এখনও কিছু-কিছু বিদ্যমান আছে। অস্ট্রিকদের আগমনে নিগ্রোবটুদের জীবনের অবসান ঘটিল। তাহাদের ভাষারও কোনও নিদর্শন এখন আর নাই। উত্তর-ভারতে এবং বাঙ্গালা দেশে বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু আর রহিল না। উত্তর-ভারত ও বাঙ্গালার লোকদের মধ্যে কচিৎ এখনও নিগ্রোবটু চেহারার লোক বা নিগ্রোবটু চেহারার আমেজ নিম্নতম শ্রেণী বা জাতিতে দেখা যায়; তাহা হইতে এই জাতির সহিত, পরবর্তী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের মিলনই সূচিত হয়।

অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে প্রথম কৃষি-কার্য ও তদবলম্বনে সঙ্ঘ-বদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান, পান, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেলের চাষ করিত; পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের খেত্ প্রস্তুত করিত, সমতল জমীতেও চাষ করিত। প্রথমটা উহাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্ণ-মুখ কাষ্ঠ-দণ্ড ব্যবহার করিত। ধনুর্বাণ ছিল ইহাদের প্রধান অস্ত্র। একখণ্ড গুঁড়ি-কাঠে তৈয়ারী ডোঙ্গায় এবং কতকগুলি গুঁড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী আকারের বড়-বড় নৌকায় করিয়া উহারা বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পার হইত। ইহারা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত—মানুষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা গাছে, পাহাড়ে, অথবা অন্য জীব-জন্তুর ভিতরে প্রবেশ করিত, এইরূপ ধারণা ইহাদের ছিল। এই ধারণাই, পরবর্তী কালে ইহাদের লইয়া হিন্দু-জাতির সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের মধ্যে উদ্ভূত পুনর্জন্ম বাদে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি—মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য দান—ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া মনে হয়। মৃতকে ইহারা হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড় বা বল্কলে জড়াইয়া বৃক্ষ-স্কন্ধে

মৃতদেহ রাখিয়া দিত ; অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার প্রস্তর-খণ্ড খাড়া করিয়া পুঁতিয়া দিত।

এই অস্ট্রিক জাতির ভাষার নিদর্শন ভারতবর্ষে আমরা কোল-ভাষাগুলিতে ও খাসিয়া-ভাষাতে পাই। এই ভাষার প্রভাব পাঞ্জাবের ভাষায়, উত্তর-কাশ্মীরের হুন্‌জা-নাগিরের Barushaski বুরুশাস্কি ভাষাতে, এবং নেপালের নবাগত কতকগুলি ভোট-চীনা ভাষাতেও আছে ; এবং মধ্য-ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর কেরলেও ইহাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরানেও ইহাদের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকা অসম্ভব নহে। ভারতের অস্ট্রিক-দের সঙ্গে যে নিগ্রোবটুদের মিশ্রণ হওয়া খুবই সম্ভব ছিল, সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমতঃ এই অস্ট্রিক জাতির লোকেরাই বাস করে ; সেখানে ইহারা কৃষি-মূলক একটা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। "গঙ্গা" এই নামটি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ বলিয়াই অনুমিত হয়। ইহাদের কৃষি-মূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি। উত্তর ভারতের সভ্য কৃষি-জীবী অস্ট্রিকেরাই (সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে নেগ্রিটোদের সহিত মিশ্রিত), পরে কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় ও অতি অল্প-স্বল্প আর্যদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়। উত্তর ভারতে তথা বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদের জড় বা মূল হইতেছে, দ্রাবিড় তথা আর্য দ্বারা রক্তে ও সভ্যতায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত (এবং সম্ভবতঃ নেগ্রিটোদের সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত) অস্ট্রিক জাতি। অস্ট্রিক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় —ইহারা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণ-যুক্ত, প্রফুল্ল-চিত্ত, দায়িত্ব-হীন, কিছু পরিমাণে অলস ও

উৎসাহ-হীন, দৃঢ়তা-বিহীন, এবং সংহতি-শক্তিতে হীন ছিল ; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল—এই প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই।

ভারতে আগত শুদ্ধ বা মিশ্রিত অস্ট্রিক জাতির সমস্ত শাখাই কৃষিজীবী বা সুসভ্য ছিল না ; কতকগুলি শাখা বনে জঙ্গলে, অনেকটা নেগ্রিটোদের মতনই শিকার করিয়া বেড়াইত। এই অরণ্যবাসী নিম্ন স্তরের অস্ট্রিকগণই "নিষাদ" ও "ভিল্ল-কোল্ল" বলিয়া প্রাচীন ভারতে খ্যাত ছিল ; এবং ইহাদেরই বংশধর হইতেছে আধুনিক কোল জাতির নানা শাখা—সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, শবর, গদব, কুর্কু, ভীল প্রভৃতি। ইহা বেশ দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্ম অনুষ্ঠানে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির স্থান অস্ট্রিক প্রভাবেরই ফল। অস্ট্রিকেরা গো-পালন করিত না, কিন্তু বোধ হয় তুলার কাপড় ইহারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ইহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, পরে ভারতে আসিয়া তাহার ব্যবহার শিখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

অস্ট্রিকদের আগমন হয় উত্তর-পূর্ব হইতে ; দ্রাবিড়েরা আসে উত্তর-পশ্চিম হইতে। দ্রাবিড়েরা সম্ভবতঃ অস্ট্রিকদের ভারতে আগমনের পরে আসিয়াছিল ; তবে এ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই ; এমনও হইতে পারে যে, একই সময়ে ভারতবর্ষে পূর্বে ও পশ্চিমে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয়ের আগমন হয়। দ্রাবিড়দের জ্ঞাতিরা ইরান, ইরাক, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে ও গ্রীসে এবং গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত, এইরূপ অনুমান হয়। আবার অস্ট্রিকদেরও প্রসার ভারতের পশ্চিমেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের অপেক্ষা সভ্য এবং সঙ্ঘ-শক্তিতে পূর্ণ ছিল বলিয়া অনুমান হয় ; ইহাদের সভ্যতা ছিল

নগরকে অবলম্বন করিয়া, অস্ট্রিকদের মত কেবল আদিম বা গ্রামীণ সভ্যতা নহে। মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিডদেরই কীর্তি বলিয়া মনে হয়। দ্রাবিড়েরা চাষ করিত—বোধ হয় যব ও গম ইহারাই বাহির হইতে ভারতে আনে, এবং ইহারা গোপালনও করিত। শিব ও উমা, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি প্রধান পৌরাণিক দেবতারা মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দেরই দেবতা ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়; যোগ-সাধন-পদ্ধতি ইহাদেরই আধ্যাত্মিক সাধনার পথ ছিল। অস্ট্রিকেরা সংখ্যা-বহুল অথবা প্রবল ছিল উত্তর-পূর্বে, ও কতকটা গঙ্গার উপত্যকায়; দ্রাবিড়েরা বোধ হয় পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতেই বেশী করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আদিম দ্রাবিড জাতির চরিত্র কি প্রকারের ছিল, তাহা পরবর্তী যুগের দ্রাবিড় সাহিত্য ও দ্রাবিড় জাতি হইতে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহারা কর্মঠ ও কৃতকর্মা অথচ ভাব-প্রবণ, mystic বা রহস্যবাদী, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসযুক্ত, শিল্পী, ও সঙ্ঘশক্তি-যুক্ত জাতি ছিল। ভারতের সর্বত্রই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের মধ্যে অল্প-বিস্তর মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এখন যেমন ছোট-নাগপুরে দ্রাবিড়-জাতীয় ওরাঁও ও অস্ট্রিক-জাতীয় মুণ্ডাদের পাশাপাশি অবস্থান করিতে দেখা যায়, বোধ হয় প্রাচীন কালে উত্তর-ভারতে ও বাঙ্গালায় বহু অংশেই সেই-রূপ ছিল। দ্রাবিড়ীয় লোকেরা ও অস্ট্রিক লোকেরা পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। মনে হয়, গঙ্গার উপত্যকায় এই দুই জাতির ও সভ্যতার বিশেষ মিশ্রণ হয়। তবে পশ্চিম-ভারতে ও দক্ষিণাপথে এবং তামিল দেশে দ্রাবিড়েরা বহুকাল ধরিয়া নিজেদের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক নামে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতের আর্য-ভাষায়—কি সংস্কৃতে, কি প্রাকৃতে,

কি আধুনিক আর্য-ভাষাগুলিতে—একটী লক্ষণীয় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক উপাদান বিদ্যমান; আধুনিক আর্যভাষাগুলিতে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট। বাঙ্গালায় ও অন্য আর্য ভাষায় এমন সব রীতি আছে যাহা বৈদিক ও অন্য আর্য ভাষায় মিলে না—অথচ সেরূপ রীতি দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষায় আছে। এই-সমস্ত বিষয় অল্প-বিস্তর অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। এগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আর্য-ভাষা উত্তর ভারতে ও বাঙ্গালায় প্রসৃত হইবার বা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, দেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল; অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার কথা দিয়াই দেশের নদ-নদী পাহাড়-পর্বত ও গ্রামের নাম-করণ করিয়াছিল, সেই সকল নামকে কোথাও ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া উত্তর কালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা সেই সকল নাম বিকৃত হইয়া, অর্থ-হীন নাম-রূপে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। (যথা—অনার্য ভোট-ব্রহ্ম ভাষায় 'দিস্তাং' হইতে 'তিস্তা' ও 'ত্রিস্রোতাঃ', কোল ভাষার 'কব-দাক্' হইতে 'কপোতাক্ষ', 'দামু-দাক্' হইতে 'দামোদর'; বিকৃত অনার্য নাম—যথা প্রাচীন বাঙ্গালার 'আউহাগড্ডি', 'দিজ্জমক্কা-জোলী', 'বখট' বা 'বহড', 'বাল্লহিট্টা', 'মোডালন্দী' ইত্যাদি, আধুনিক বাঙ্গালার 'বালুটে, মুড়ুন্দী, বয়ড়া, চুঁচুড়া, পাবনা, বগুড়া', ইত্যাদি।) এখন হইতে আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরাই বাঙ্গালা দেশে বাস করিত, সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া তাহারা ছিল; দেশে তখন আর্য ভাষা স্থাপিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়; ইহাদের পরে আসিল আর্য, এবং তৎপরে ভোট-চীন। ভোট-চীন জাতির শাখা—ভোট-ব্রহ্ম, শ্যাম-চীন, ও অন্যান্য। ইহাদের আদি পিতৃভূমি ছিল Yang-tsze-Kiang য়াঙ্-ৎসে-

কিয়াঙ্ নদীর উৎপত্তি-স্থলে। ইহারা খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি ভারতের দিকে আসে, এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভোট বা তিব্বত হইতে ইহাদের কতকগুলি দল ভারতে প্রবেশ করে; আবার ইহাদের অন্য কতকগুলি দল ('বড' বা 'মেচ' শাখা) আসাম ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা দিয়া উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। কোন সময়ে ইহাদের বঙ্গদেশে আগমন হয় তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পূর্বে 'কম্বোজ' নামক একটী জাতি উত্তর-বঙ্গে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে এই 'কম্বোজ' শব্দটী 'কোঁচ' বা 'কোচ' শব্দের একটী প্রাচীন রূপের সংস্কৃতীকরণ মাত্র—'কোঁচ' বা 'কম্বোজ'-গণ ভোট-চীন জাতিরই একটী শাখা। কিন্তু অন্য মত অনুসারে, এই 'কম্বোজ'-গণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের—পাঞ্জাব সীমান্তের—'কম্বোজ' জাতিরই একটী শাখা; পশ্চিমের এই কম্বোজগণ আর্য-ভাষী, জাতিতে ভোট-চীন শ্রেণীর নহে। যাহা হউক, মনে হয়, ভোট-ব্রহ্ম জাতির মানুষ বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব সীমানায় এখন হইতে দুই হাজার বৎসরের পূর্বেই আসিয়াছিল। তখন বাঙ্গালা দেশের মিশ্র দ্রাবিড ও অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতের আর্য ভাষা এবং আর্য বা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সভ্য-বদ্ধ ভোট-চীন জাতির যে লোকেরা ভারতে আসিয়াছিল, তাহারা, অনুমান হয়, প্রকৃতিতে প্রফুল্ল-চিত্ত, কর্মঠ, শ্রমী, ও কল্পনা-বিহীন ছিল। চীন-দেশে এই জাতি এক বিরাট সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোনও বড় সংস্কৃতি ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা বাঙ্গালা দেশের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য সভ্যতা মানিয়া লইয়া, উত্তর-ও পূর্ব-বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে—এবং এখনও হইতেছে। সংস্কৃতির দিক হইতে, বাঙ্গালী সংস্কৃতির গঠনে, ভোট-চীন জাতির দান নগণ্য বলিয়াই মনে হয়।

উত্তর-ভারতে নেগ্রিটো অবলুপ্ত; অস্ট্রিক, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক, মিশ্র নেগ্রিটো ও দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়, এই সব জনগণ, যখন উত্তর-ভারতের অনার্য জাতিরূপে নিজ মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া বাস করিতেছে, যখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং দেশে কোনও ঐক্য-বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না;—এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্ত-রূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলা-সম্পন্ন, সুদৃঢ়-রূপে সঙ্ঘ-বদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ অথচ নূতন বস্তু উপযোগী হইলে গ্রহণ করিতে সদা-চেষ্টিত, এমন আর্য জাতি ভারতে দেখা দিল। আর্যেরা আসিয়া খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক-ধর্ম-রাজ্য পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল। আর্যদের আগমন কখন ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটা মত এই যে, পূর্ব-ইউরোপের কোনও স্থানে আর্যদের আদি পিতৃভূমি ছিল; সেখান হইতে তাহারা (হয় মাসিডন ও থ্রেশিয়া এবং কৃষ্ণ-সাগরের দক্ষিণে এশিয়া-মাইনরের উত্তর ভাগ হইয়া, না হয় কৃষ্ণ-সাগরের উত্তরে দক্ষিণ-রুষ হইয়া, ককেসস্ পর্বত পার হইয়া) প্রথমটায় মেসোপোতামিয়ায় আসে। সেখানে বাবিল ও আসুরীয় জাতি এবং অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত সংস্পর্শে আসে; পরে খ্রীঃ-পূঃ ১৫০০-র দিকে, ইহাদের কতকগুলি দল পূর্বে পারস্য-দেশে ও ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। ভারতবর্ষে তাহারা বৈদিক ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত লইয়া আসিল; তাহারা আনিল তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি; সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য জাতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

ভারতবর্ষের সু-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, সব রকমের অনার্য আদিম

অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের প্রথম সংস্পর্শ হয় তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য ভারতে আর্যদের উপনিবেশ হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ—অনার্য ও আর্য—পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্যেরা বিদেশ হইতে আগত, এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চে ছিল না। আর্যদের ভাষা আসিয়া, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল; উত্তর-ভারতের কোল ও দ্রাবিড় অনার্যদের মধ্যে ঐক্য-বিধায়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য-জাতির বিজেতৃ-মর্যাদা লইয়া আর্য-ভাষা সে অভাব পূর্ণ করিল। ক্রমে ক্রমে ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত এক হাজার বৎসরের মধ্যে, গান্ধার হইতে বিদেহ ও চম্পা (অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম সীমা) পর্যন্ত প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারতে আর্য-ভাষার জয়জয়কার হইল; আর্য ও অনার্য—দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক—মিশিয়া, উত্তর-ভারতের (অর্থাৎ পাঞ্জাবের ও বিহার পর্যন্ত গাঙ্গ উপত্যকার) হিন্দুজাতিতে পরিণত হইল। আর্যের ভাষা ও আর্যের ধর্ম—বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্যেরা শিরোধার্য করিয়া লইল; অনার্যেরা আর্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনার্যের ধর্ম মরিল না, অনার্যের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগ-চর্যায় তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে, আর্যদের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য ও অনার্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ন করা হইল।

উত্তর-ভারতের গঙ্গা-তীরের আর্য সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতায় আর্য অপেক্ষা অনার্যের দানই অনেক বেশি—কেবল আর্যদের ভাষা ইহার বাহন হইল। আর্য ও অনার্যের রক্তের মিশ্রণ

পাঞ্জাবে আর্যদের আগমনের সময় হইতেই হইতেছিল ; গঙ্গাতীরবর্তী দেশ-সমূহে ইহা আরও অধিক পরিমাণে হইল। কোথাও বা জাতিকে জাতি দ্বিজত্বের অর্থাৎ আর্যত্বের দাবী করিয়া বসিল, এবং বহু স্থলে ক্রমে-ক্রমে সে দাবী স্বীকৃতও হইল। বাঙ্গালা দেশে আর্য-ভাষা লইয়া যখন উত্তর-ভারতের—বিহার ও হিন্দুস্থানের—লোকেরা দেখা দিল, যখন উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য-অনার্য জাতির সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ ও বাঙ্গলা দেশে আসিল, তখন উত্তর-ভারতে মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাতি হইয়া গিয়াছে। রক্তের বিশুদ্ধি বোধ হয় তখন আর কোনও আর্যবংশীয়ের ছিল না।

মৌর্যরাজগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বে, বাঙ্গালা দেশে আর্য-ভাষার ও আনুষঙ্গিক উত্তর-ভারতের গাঙ্গ-উপত্যকার সভ্যতার বিস্তার ঘটে নাই বলিয়া অনুমান হয়। মৌর্য-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত-রাজবংশের রাজত্ব পর্যন্ত—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ পর্যন্ত, এই আট শত বৎসর ধরিয়া, ভাষায় বাঙ্গালা দেশের আর্যীকরণ চলিতেছিল ; এই আট শ' বছর ধরিয়া বাঙ্গালার অস্ট্রি- ও দ্রাবিড়-ভাষী জনগণ নিজ অনার্য ভাষা-সমূহকে ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে আর্য-ভাষা—অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত—গ্রহণ করে ; উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর-ভারতের আর্য ও অনার্যের ইতিহাস ও পুরাণ—বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল ; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল, তাহাও বাঙ্গালায় গৃহীত হইল।

এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য—এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর-ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন এই নব-সৃষ্ট আর্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্ম-নীড় হইল।

রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অনার্য ছিল। যেটুকু আর্য রক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল, সেটুকু আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য মিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য-ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটী, যাহাকে ইংরেজীতে discipline বলে, তাহা পাইল; বাঙ্গালীর অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য মনের—ব্রাহ্মণ্যের—এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে যখন চীনা পরিব্রাজক Hiuen Tsang হিউএন্-ৎসাঙ্ বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় যে, তখন সমস্ত বাঙ্গালা দেশটা আর্য-ভাষী হইয়া গিয়াছিল। তারপরে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বরেন্দ্র-ভূমিতে পাল-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হইল, নব-সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতি নবীন এক গৌরবময় জীবনে প্রবেশ-লাভ করিল। প্রথমটায় বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতেরই চর্চায় তৎপর হইলেন। তাহার পরে তাঁহারা দেশ-ভাষার দিকে দৃষ্টি দিলেন। পাল-রাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই মাগধী-প্রাকৃত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে একটু বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষা, একটী স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্য-ভাগ হইতে বৌদ্ধ গুরুদের হাতে এই স্বতন্ত্র ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায়, সাহিত্য-সৃষ্টি—গান-রচনা—হইতে লাগিল।

আমাদের বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসের কাঠামো বা মূল-কথা এইরূপ বলিয়াই আমার ধারণা। আর্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির গঠনের সঙ্গে-সঙ্গে যখন বাঙ্গালীর

সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়, তখন কেহ বাঙ্গালীর নিজস্ব অনার্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই ; তখন যে ছাঁচে বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য—রীতি-নীতি শিল্প-সাহিত্য সবই ঢালা হইয়াছিল, তাহা ছিল উত্তর-ভারতের বা নিখিল ভারতের সর্ব-জয়ী হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) মন,—ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি শিল্প ও সাহিত্য। যে ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচ এখনও বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যমান। উপস্থিত কালে, অর্থনৈতিক ও মানসিক নানা বিপর্যয় এবং বিপ্লবের আগমনে, আমরা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আমাদের সমাজকে ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া আবার এক নূতন ছাঁচে ঢালিতে যাইতেছি।

পাল-যুগে নূতন-সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতির মনের সুর, তাহার আর্য-ভাষার তারকে অবলম্বন করিয়া, উত্তর-ভারতের মনের সঙ্গে যে ভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, মোটের উপরে সে সুরটী এখনও প্রবল ভাবে বিদ্যমান। এই একই সুরে নানান্ ঝঙ্কার শুনা গিয়াছে ; কখনও বৌদ্ধ, কখনও ব্রাহ্মণ্য ; ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে কখনও বৈদিক (বৈদিকের ঝঙ্কার বাঙ্গালা দেশের সুরে চিরকালই অতি ক্ষীণ ভাবে শুনা গিয়াছে), কখনও শৈব, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণব ; এবং কখনও মুসলমান সূফী। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রও এই ঝঙ্কারের অন্যতম।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল। তারপর তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের ঝড় বহিয়া গেল। মনে হইল, বুঝি সে ঝড়ের মুখে বঙ্গ-বীণার বাঁধা তার ছিঁড়িয়া যাইবে,—প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতীয়তার সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তখন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রান্তিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ হয় নাই—তখনকার

দিনের বাঙ্গালীর সাহিত্যিক গৌরব ছিল না, বাঙ্গালী নিজেকে এক অখণ্ড ভারতেরই প্রত্যন্ত- বা প্রদেশ-বাসী বলিয়া মনে করিত। যে ঝড় কাবুল হইতে বিহার পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থানে বহিয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। তাহাকে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু এই বৈতসী বৃত্তির মধ্যেই তার জীবনী শক্তি অটুট রহিল। মুষ্টিমেয় তুর্কী বিজেতা ও তাহাদের পারসীক, পাঠান ও পাঞ্জাবী-মুসলমান অনুচর যাহারা বাঙ্গালায় রহিয়া গেল, তাহারা বাঙ্গালার হিন্দুর সাহায্যেই বাঙ্গালায় দিল্লী হইতে স্বাধীন এক মুসলমান-শাসিত রাজ্য স্থাপন করিল। তুর্কী ও অন্য বিদেশী বিজেতৃগণ দুই-চারি পুরুষের মধ্যেই বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উর্দু ভাষার উদ্ভব হয় নাই। উত্তর-ভারতের সঙ্গে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সে যোগ তুর্কী-বিজয়ের পরে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানদের বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত ; তাহাদের সন্তানেরা ভাষায় বাঙ্গালীই হইত।

প্রথম সঙ্ঘাতের পরে, বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিশ্র মুসলমান এবং দেশের হিন্দু বাঙ্গালী জন-সাধারণের মধ্যে একটী সংস্কৃতি-বিষয়ক সহযোগিতা আরম্ভ হইল। মুসলমান সুফী, দরবেশ, ফকীর ও গাজী ধর্ম-প্রচারের জন্য উত্তর-ভারত হইতে এবং কচিৎ ভারতের বাহির হইতেও বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের অনেককে বল-পূর্বক মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে ; তবে পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালা দেশে যে মতের মোহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটী শরিয়তী অর্থাৎ

কোরান-অনুসারী ইসলাম নহে। শরিয়তী মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে; বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সূফী মতই বেশী প্রসার লাভ করে। সূফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। সূফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালায় প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্য-যুগে তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ-গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ইস্‌লাম ধর্ম বাস্তবিকই "মজ্‌মু'অ অল্‌-বহ্‌রৈন্‌" অর্থাৎ 'দুইটী সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত মোহম্মদ এনামুল্‌ হক্‌ বঙ্গদেশে ইস্‌লাম-প্রচার বিষয়ে যে মূল্যবান্‌ গবেষণা করিয়াছেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির একটা প্রধান দিকের ইতিহাসের উপর লক্ষণীয় আলোক-পাত দেখিতে পাইব।

তুর্কী-বিজয়ের পরে যেমন এক দিকে মুসলমান-ধর্ম-প্রচার চলিতে লাগিল, তেমনি অন্য দিকে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ-নেতৃগণ ঘর সামলাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। দেশে যখন ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ মতাবলম্বী হিন্দু রাজা ছিলেন, ভারতের বাহিরের দেশের প্রতি অথবা ধর্ম-গুরুর প্রতি তাকাইয়া থাকে এমন বিদেশীয় ধর্ম যখন দেশে ছিল না, তখন দেশের জন-সাধারণের প্রতি শিক্ষিত বা অভিজাত সমাজের দৃষ্টি ততটা আকর্ষিত হয় নাই। অশিক্ষিত জন-সাধারণ চিরাচরিত রীতি অনুসারে গ্রাম্য ধর্ম পালন করিত, উচ্চ বর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা পূজা যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদিতে যোগ-দান করিত; তাহাদের মধ্যে ধর্ম-পিপাসা জাগাইবার এবং মিটাইবার জন্য যোগী, সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু ছিল; তাহারা

নিজেরাও নানা পর্ব-দিবস পালন করিত, সমাজের মন্থর গতির সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া তাহারও মোটামুটি ভাবে ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা করিত। কিন্তু মুসলমান প্রচারক আসিলেন; তাঁহার পিছনে ছিল মুসলমান রাজার প্রচণ্ড শক্তি; মুসলমানের ধর্ম সহজ-বোধ্য—তাহাতে হিন্দু অর্থাৎ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সূক্ষ্ম intellectualism বা আর্থি মানসিকতা নাই বলিয়াই, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে আপাত গ্রহণীয় ছিল। অবস্থা দেখিয়া উচ্চ-বর্ণের হিন্দুও সজাগ হইলেন। তখন বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের যুগ, বৌদ্ধ ধর্ম তখন তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জমান। তুর্কীদের আগমন ও মুসলমান রাজ-শক্তির প্রতিষ্ঠা, এবং ভারতে (বিশেষ করিয়া বঙ্গে) বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ-লাভ—এই দুইটী কাকতালীয় ন্যায়ে হইয়াছিল। জীবনী শক্তিতে হীন বৌদ্ধ ধর্ম, নব শক্তিতে জাগ্রৎ পুরাণ ও তন্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিকট পরাভূত হইতেছিল; ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অনুগামীর দল নব উৎসাহে তখন বেদ উপনিষদ্ পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট নব হিন্দু ধর্মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। সমাজে তখন ব্রাহ্মণই প্রধানতম চিন্তানেতা; বৈদ্য এবং কায়স্থও এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। বাঙ্গালার ক্ষাত্র শক্তি তখন কায়স্থ এবং অন্য কতকগুলি জাতির মধ্যে সজীব অবস্থায় বিদ্যমান; এবং বৈদ্য এখনকার মত তখনও বিদ্যাবৃত্ত। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসর্বস্ব, এবং বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির বলে রাজসেবা কার্যেও নিযুক্ত। দেশের মধ্যে বাঙ্গালা প্রভৃতি লোক-ভাষা তখন সাহিত্যের উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা বুঝিয়া, উচ্চ-বর্ণের হিন্দু, সাধারণের জন্য শাস্ত্রকে উন্মুক্ত করিয়া দিতে সচেষ্ট হইলেন। তুর্কী-বিজয়ের পরে, কেরামত জাহির করেন এমন পীর ও আউলিয়াদের দ্বারা মুসলমান ধর্মের প্রচারের ফলে, উত্তর-ভারতের সর্বত্র লোক-ভাষায় হিন্দুর ধর্ম-গ্রন্থ প্রচারের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। হিন্দী-

মারাঠী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে নিবদ্ধ আমাদের সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণা এই খানেই—রাজশক্তিতে শক্তি-শালী, সহজ-বোধ্যতায় প্রবল মুসলমান ধর্মের সমক্ষে, জন-সাধারণের নিকটে হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম-শাস্ত্র ও ইতিহাস, তৎসঙ্গে গভীর অধ্যাত্ম-চর্চার অনুভূতি, এবং প্রাচীন উপাখ্যানাবলীর অন্তর্নিহিত রোমান্স ও উচ্চ আদর্শাবলী—এগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দিবার ইচ্ছাতেই;—কৌতূহলী বিদেশী মুসলমান রাজাদের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য মধ্য-যুগের ভারতের ভাষা-সাহিত্যের সৃষ্টি বা আরম্ভ হয় নাই।

তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের প্রথম যুগের পরে বাঙ্গালী যখন আত্ম-রক্ষায় তৎপর হইল, তখন কেবল সাহিত্য-রচনাতেই তাহার দৃষ্টি বা চেষ্টা নিবদ্ধ রহিল না। বাহিরের ধর্ম ও রাজশক্তির হাত হইতে দেশকে আবার স্বাধীন করিয়া দেখিবার স্বপ্নও তাহাকে বিচলিত করিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে "চণ্ডীচরণ-পরায়ণ" মহারাজ শ্রীদনুজমর্দন দেব দেখা দিলেন। ইনি সমগ্র বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজা হন, এবং যে কার্য সারা উত্তর-ভারতের কোন হিন্দু রাজা তুর্কী-বিজয়ের পরে করিতে সাহসী হন নাই, সেই কার্য ইনিই করিয়াছিলেন—নিজ নামে দেশ-ভাষায় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। দনুজমর্দন দেবকে অনেকে মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত রাজা "কান্‌স্" ('কাঁশ' বা কংশ)-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। এই রাজা কংশই বাঙ্গালা রামায়ণের রচয়িতা ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এইরূপ অনুমান হয়। সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু রাজা দনুজমর্দন দেব কংশ, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ ভাষায় প্রচারে উদ্যোগী; কর্ম-চেষ্টা ও জাতীয় সাহিত্যের প্রসার, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে নিঃসন্দেহ দুই-ই সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছিল।

এই রূপে ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের ফলে বাঙ্গালা দেশে যাহা ঘটিল, তাহা বাঙ্গালী জাতির উত্তর-কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিস্ফুট। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কৃতে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ, সারদাতিলক তন্ত্র প্রভৃতি পড়িতেন—চৈতন্যদেবের পূর্বেকার কালে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা এই-সব সংস্কৃত পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্য প্রতিষ্ঠানের পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়া আছে। এই প্রকারের ইতিহাস ও পুরাণ-গ্রন্থ ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। জন-সাধারণে ইহার স্বাদ পাইল। কথকতা—ভারত-পুরাণ পাঠ—সংস্কৃতি-প্রচার বিষয়ে দেশের এক প্রাচীন পদ্ধতি ছিল। বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় পুরাণ-কথা, যেগুলি সংস্কৃতে লিপি-বদ্ধ হয় নাই বলিয়া ভারতের অন্যত্র সম্পূর্ণ-ভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই, সেগুলিও নবীন "মঙ্গল-কাব্য" আকারে বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সব স্থানীয় পুরাণ মধ্যে, বৌদ্ধ পুরাণও বাদ পড়িল না। এই ভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শিবায়ণ ও অন্য পুরাণের আখ্যায়িকার পাশে, লখিন্দর-বেহুলা কালকেতু-ফুল্লরা ধনপতি-খুল্লনার কথা এবং লাউসেন ও গোপীচাঁদের কথাও বহুল ভাবে পুনঃ-প্রচারিত হইল। প্রাচীন কথা ও লোক-গাথা মঙ্গল কাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল। সমাজের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংরক্ষক ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার নূতন করিয়া জ্ঞান-বল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হইল। স্বদেশে সংস্কৃত বিদ্যা মৃতপ্রায়; সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা হয় নালন্দার বিহারের মত অন্যান্য বিহারের ধ্বংসের কালে তুর্কীর ভল্ল ও তরবারীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন, না-হয় পুঁথি-পত্র লইয়া তাঁহারা নেপালে পলাইয়া গিয়া প্রাণ ও বিদ্যা উভয়েরই রক্ষা করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে তুর্কীর আগমনে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পলায়ন করিয়া পূর্ব-বঙ্গের নদী খাল বিলের দ্বারা সুরক্ষিত জনপদে আত্মরক্ষা

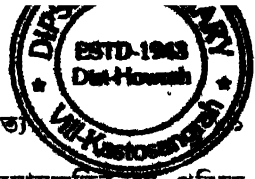
করিতেছেন। তাঁহাদের বিদ্যা দেশের কেন্দ্র-স্থলে না থাকায় আর কার্যকর হইতেছে না। তখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবটু বিদেশ হইতে সংস্কৃত জ্ঞানকে আবাহন করিয়া আনিবার জন্য বাহির হইলেন। মিথিলা সে যুগে কেমন করিয়া তুর্কীর অধীন হয় নাই। হিন্দু রাজা ছিল বলিয়া, তুর্কী-বিজয়ের পরে ধ্বংসের শতকেও মিথিলায় সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্রস্থল-গুলি জীবিত ছিল—বাঙ্গালীর ছেলেরা সেখানে বিশেষ করিয়া ন্যায়-শাস্ত্র ও স্মৃতি পড়িতেই যাইত। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও পক্ষধর মিশ্রের কথা আমরা সকলেই জানি। মিথিলায় যে সব ছেলে পড়িতে যাইত, তাহারা কেবল যে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িত তাহা নহে। মিথিলার দেশভাষা মৈথিলে ঐ প্রদেশের পণ্ডিতেরা সুন্দর সুন্দর গান বাঁধিতেন। কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর (ইঁহার জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ) মৈথিল কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ বাঙ্গালী ছাত্রদের দ্বারায় বাঙ্গালা দেশে আনীত হয়, এবং সেই সকল পদের অপূর্ব কবিত্বে বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে মোহিত হইয়া যান—বাঙ্গালা দেশে সেগুলির বহুল প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের অনুকরণও আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতির পদের মৈথিল ভাষা বাঙ্গালীর মুখে অবিকৃত থাকিতে পারিল না; এবং বাঙ্গালীর হাতে বিদ্যাপতির পদের নকলে মৈথিল ভাষাও ঠিক থাকিল না। বিদ্যাপতির পদের ভাষা বিকৃত হইল, আবার বাঙ্গালা ও মৈথিল এই দুই ভাষা মিলিয়া, মৈথিলের নকলে এক অতি মধুর কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষার সৃষ্টি করিল, এই ভাষার নাম হইল "ব্রজবুলি"। বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যের অনেকখানি অংশ এই ব্রজবুলিকে লইয়া।

এই ভাবে বাঙ্গালার পণ্ডিতের হাতে দুই দিকে কাজ চলিল; বাঙ্গালার সংস্কৃতির দুইটী দিক্-ই ইঁহারা পুষ্ট করিতে লাগিলেন—সংস্কৃত

বিদ্যা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার মস্তিষ্ক খেলিতে লাগিল ; এবং বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা, যাহাতে বাঙ্গালার হৃদয়ের প্রকাশ হইল। এই দুই দিকেই, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবই ছিল মূল প্রেরণা। বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনে যে ডাক ও খনার বচন ছিল, বাঙ্গালার ব্রতকথায় যে, কবিতা ও আখ্যায়িকা ছিল, তাহা প্রাচীন মুসলমান-পূর্ব যুগের সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। তুর্কী-বিজয়ের দেড়-শত দুই-শত বৎসরের মধ্যে যখন সমস্ত উত্তর-ভারতময় মুসলমান ভাব-জগতের প্রতাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের জীবনে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন সহজ-বোধ্য ভক্তি-মার্গ পুনরায় প্রকটিত হইল, "নাম-ধর্ম" প্রসার-লাভ করিল। নাম-ধর্মের নানা সাধক দেখা দিলেন ; রামানন্দ কবীর প্রমুখ উত্তর-ভারতের সন্ত-মার্গী সাধুগণ ; বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যদেব ; এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তৎশিষ্য ও অনুশিষ্য শিখ গুরুগণ।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনেকটা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবকেই আশ্রয় করিয়া পুষ্টি-লাভ করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নূতন ধারা সৃষ্ট বা প্রবর্তিত করিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার মর্যাদা তাঁহার হাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের গুরু-পরম্পরা, সংস্কৃত ভাষায় যে দার্শনিক বিচার প্রকট করিলেন, যে রস-শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যে সকল মূল গ্রন্থ, টীকা ও কাব্যাদি রচনা করিলেন, তাহা বিদ্যা ও বুদ্ধির দিক হইতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির অপূর্ব সৃষ্টি ; বাঙ্গালীর বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্য-ন্যায়ের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের এবং শ্রীকুল্লুকভট্ট শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ টীকাকার ও সংকলয়িতাদের মেধায় দেখা যায়, তেমনি ইহা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যদের পাণ্ডিত্যেও দেখা যায়। আবার



বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙ্গালীর হৃদয়ের, তাহার রসানুভূতির যে পরিচয় পাই, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুপ্রেরণার ফল। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার জন-সঙ্গীত কীর্তন গানে যে লক্ষণীয় এবং অতি বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিল, বাঙ্গালার নিজস্ব সঙ্গীতের প্রাণ-স্বরূপ সেই কীর্তন গানও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ। ঘরমুখা বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া নূতন উদ্যমে পুরী গয়া কাশী বৃন্দাবনে গেল, জয়পুরে গেল, এবং আরও পশ্চিমে গেল;—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল। এখানেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রভাব দেখি।

বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টি-লাভ করিয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালা-দেশ বোধ হয় আদিম অস্ট্রিক জাতি হইতে প্রাপ্ত রিক্থকেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া সভ্যতার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। গ্রামের বড় দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা। ইউরোপের সভ্যতা অর্থে Civilisation—যাহা civis বা নগরকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, "নাগরিকতার ভাব"; ইউরোপের polis বা নগর হইতে Politics-এর উৎপত্তি। আরবদের মধ্যেও "মদীনা" বা নগরের জীবন-যাত্রাই "তমদ্দুন" বা সভ্যতা। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কখনও নগরের প্রাধান্য ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিল্প-সম্ভারপূর্ণ, বিরাট্ মন্দির ও অন্য গৃহে শোভিত, বড় বড় নগর প্রাচীন কাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়; যেমন, প্রাগৈতিহাসিক মোহন-জো-দড়ো, হড়প্পা; প্রাচীনকালের অহিচ্ছত্র, মথুরা, কাশী, পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা সাকেত, গোনর্দ, উজ্জয়িনী, প্রতিষ্ঠান,

ধান্যকটক (অমরাবতী), মহাবলিপুর, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি, যে-সব নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাই ; মধ্য যুগের দিল্লী, আগরা, লাহোর, মদুরা, পুনা, মাণ্ডু প্রভৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে নগরাদির ধ্বংসাবশেষ যে-রূপ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সে-রূপ ততটা পাওয়া যায় নাই ; কাশী, মথুরা, পুনা, উজ্জয়িনী, লাহোর প্রভৃতির সহিত এক সঙ্গে নাম করা যায় এমন নগর বাঙ্গালা দেশে বেশী গড়িয়া উঠে নাই—বাঙ্গালা দেশের নাগরিক জীবন মুখ্যতঃ গ্রামের জীবনেরই একটী বিস্তৃত সংস্করণ ছিল। বাঙ্গালার নগরের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি দুই-একটীর নাম মাত্র করা যায়। বাঙ্গালাদেশ ভারতের জীবনের স্রোতের এক পাশে, একটু যেন বিচ্ছিন্ন ভাবেই বরাবর ছিল। শিল্প-নগরী রূপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পশ্চিম-বঙ্গে বিষ্ণুপুর বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সময়ের বিষ্ণুপুরের হঠাৎ বড় হইয়া উঠার দুইটি কারণ ছিল—[১] উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব উপকূলের সহিত উত্তর-ভারতের যোগ-বিধায়ক পথের উপরেই বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল ; সেইজন্য উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তীর্থ-যাত্রা ও অন্য উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা যাতায়াত করিত, তাহাদের মারফত বাহিরের জগতের সহিত বিষ্ণুপুরের সংযোগ সহজ হইয়াছিল ; [২] বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালা-দেশের ও হৃদয় স্থানীয় নবদ্বীপ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরিয়া, কতকগুলি বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কর্মী বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বাহিরেও একটী বিরাট কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ যেমন একদিকে ছিল শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা, অন্য দিকে ছিল—বাঙ্গালাদেশের স্বাধীন মুসলমান নরপতির হাত হইতে মুক্ত হইয়া, দেশ মোগল সম্রাটের অধীন হওয়া। স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের

এক কোণে পড়িয়া ছিল, এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মত অবস্থায় ছিল; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার তেমন কোন যোগ ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাংলার পক্ষে আংশিক ভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভবপর হইল। দিল্লী-আগরার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালার পক্ষে হিতকর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা বাঙ্গালার বাহিরে আদর পাইল—বাঙ্গালার বিদ্যাধর পণ্ডিত জয়পুর-নগর স্থাপন কালে সাহায্য করিলেন (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ), বাঙ্গালার পণ্ডিত ও গোস্বামীরা উত্তর-ভারতের ধর্ম-জীবনে অংশ-গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্যের মতকে উত্তর-ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, দিল্লী-আগরা জয়পুর-চিতোর হইতে পারস্য ও তুরস্ক পর্যন্ত সর্বত্র রাজদরবারে বাঙ্গালার ঢাকাই মলমলের চাহিদা বাড়িয়া গেল, বাঙ্গালার বাঁশে তৈয়ারী কুঁড়ে ঘরের বাঁকা ধাঁচা, 'রেওটী' নামে রাজপুত-মোগল বাস্তু-শিল্পের মধ্যে স্থান পাইল। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, হিন্দু-যুগের অবসানের পরে, বাঙ্গালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী প্রথম কাটাইয়া, নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল। সপ্তদশ শতকে উত্তর-ভারতের লোক-ভাষা ('হিন্দী') হইতে বাঙ্গালাতে দুইখানি বই অনূদিত হইল—নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল', এবং মালিক মোহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবত'।

দিল্লী-আগরা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে যে যোগ নূতন করিয়া মোগল-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল, সে যোগ আর বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এই যোগকে একটা বড় স্থান দিতে হয়।

যদিও বাঙ্গালী জাতির অর্ধেকের উপর এখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহা লক্ষণীয় যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবী, ফারসী ও উত্তর-ভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব সভ্যতা, রীতি-নীতি এবং চিন্তা-প্রণালী) বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনেও তেমন কার্যকর হয় নাই। স্থফী মতের ইস্‌লামের সহিত বাঙ্গালী (অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু) মনোভাবের একটা আপস হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান (কতকগুলি বিশেষ প্রান্তে, বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত), বিশিষ্ট মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। যে দুই-চারি জন বড বড় আলেম, মোল্লা ও মৌলবী বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে হইতেন, তাঁহারা নিজেদের আরবী-ফারসী কেতাবের মধ্যেই নিমগ্ন থাকিতেন, বাঙ্গালা ভাষার চর্চা তাঁহারা বড় একটা করিতেন না ; ফলে, আরবী-ফারসী জগতের খবর বাঙ্গালীর কাছে বেশি করিয়া পঁহুছায় নাই। কিছু কিছু আরবী প্রার্থনা, মুসলমানী স্মৃতি-শাস্ত্রের কথা, এবং মুসলমানী ইতিহাস-পুরাণ কেচ্ছা-কাহিনী বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র। উত্তর-ভারতের এবং ভারতের বাহিরের দেশের মুসলমান সংস্কৃতির সহিত এবং কোরান-অনুমোদিত ইস্‌লামের সহিত বাঙ্গালী মুসলমান অতি আধুনিক কালে—বিগত মাত্র ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে—একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নানা কারণে তাহার জীবনে সে পরিচয় কার্যকর হইতেছে না।

বাঙ্গালী মুসলমান এখনও মনে-প্রাণে খাঁটী বাঙ্গালী থাকায়, নব-আলোচিত বঙ্গ-বহির্ভূত মুসলমানী সংস্কৃতি তাহার প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিতেছে না। এই আলোচনা মুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ, এবং ইঁহাদের জ্ঞান মুখ্যতঃ

মুসলমান-সভ্যতা-বিষয়ক ইংরেজী পুস্তক হইতেই সংগৃহীত। বাঙ্গালী মুসলমান এখন বিষম দো-টানায় পড়িয়াছে। সজ্ঞান ভাবে একটী জাতির মনের মোড় ফিরানো কঠিন ব্যাপার—অজ্ঞাত-সারেই এই কার্য হইয়া থাকে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ-কেহ এখন একটী "বাঙ্গালী মুসলমান সংস্কৃতি" গঠনের প্রয়াস করিতেছেন। সহজ বাঙ্গালীত্বের দাবীতে—বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি যে তাহারই, এই সহজ বোধে—বাঙ্গালী মুসলমান সমগ্র ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার কিন্তু এখন তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না—কারণ ইহার সঙ্গে কোরানের বা আরব জগতের কোনও যোগ নাই। তাহার মনে অস্বস্তির ভাব আসিয়াছে। যতই কেন "মুসলমান ইতিহাস", "মুসলমান সভ্যতা" বলিয়া বাঙ্গালী মুসলমান নিজের উৎসাহাগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন না, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আরবেরা সিরিয়া, পারস্য ও মিসরে যে বীরত্ব দেখাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই বীরত্বের কাহিনীতে, ইংরেজীতে যাহাকে বলে legitimate pride—ন্যায়-সঙ্গত গর্ব—তাহা তাঁহার মনের অন্তস্তল হইতে অনুভব করা কঠিন। বাঙ্গালী মুসলমানেব পক্ষে, সপ্তম শতকের আরব শৌর্য, বা দশম শতকের বগ্‌দাদের আরব, পারস্য ও সিরীয় পাণ্ডিত্য ও মানসিক উৎকর্ষ, বা ত্রয়োদশ শতকের স্পেনের স্পেনীয়, আরব ও মঘরেবী নাগরিকতা ও সভ্যতা, অথবা পঞ্চদশ শতকের তুর্কী বীরত্ব,—কেবল সমধর্মিত্বের দোহাই পাড়িয়া এগুলি লইয়া গর্ব করিতে রসবোধ-যুক্ত যে কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের মনে বাধো-বাধো লাগিবে, তাঁহার হাসি পাইবে; আমার "মুসলমানজাতি" কত বড়, এই গর্ব করিয়া কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে উর্দু কবি ইক্‌বালের উক্তি—

অয়্ গুল্‌সিতান্-এ-উন্দুলুস্, বহ্ দিন হৈ য়াদ তুঝ কো,
থা তেরী ডালীওঁ-মেঁ জব্ আশিয়াঁ হমারা॥
মগ্‌রিব কী বাদীওঁ-মেঁ গুন্‌জী আজাঁ হমারী॥

হে আন্দালুসিয়ার পুষ্পোদ্যান, সে দিন তোমার স্মরণে আছে কি, যে দিন তোমার শাখায়-শাখায় আমাদের নীড় অবস্থিতি করিত (অর্থাৎ আমাদের জাতি এক সময়ে স্পেন দখল করিয়াছিল); মগ্‌রেব্ (মরক্কোর) মরুভূমির নদীর তীরে আমাদেরই আজান-ধ্বনি গুঞ্জিত হইয়াছিল (অর্থাৎ আমরা মুসলমানেরাই মরক্কো জয় করিয়াছিলাম)—

ইত্যাদি গৌরব-গাথা তাঁহার কাছে নিজ ভারতীয়ত্বের বা বাঙ্গালীত্বের দৈন্যকে যেন উপহাস করিবে। কোনও বাঙ্গালী রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান যদি গর্ব করে—"আমরা রোমান-কাথলিক জাতীয় লোক, আমরা কত বড়! আমাদের জাতি স্পেন হইতে আমেরিকায় গিয়া আমেরিকা দখল করিয়াছিল—মেক্সিকো ও পেরুর মত দুই-দুইটা সুসভ্য জাতির রাজ্য হেলায় জয় করিয়া সেখানে আমাদের ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়াছিল; আমাদের রোমান-কাথকিক জাতি পোর্তুগাল হইতে বাহির হইয়া ব্রেজিল দখল করিয়াছিল, ভারতের সমুদ্রপথে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিত; আমাদের জাতিই ফ্রান্সে, ইটালীতে, স্পেনে, জর্মানীতে কত বড়-বড় গির্জা নির্মাণ করিয়াছে, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যায় কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কত দর্শন-শাস্ত্রের বই লিখিয়াছে, কত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে,"—তাহা হইলে ইহা যেমন শুনায়, বাঙ্গালা-ভাষী, জাত্ বাঙ্গালী ঘরের ছেলে, কেবল ধর্মে মুসলমান বলিয়া, ইরানী, তুর্কী, আরব, শামী, মিসরী, মগরেবী ও হিস্পানীদের কীর্তি-কলাপ লইয়া গৌরব-বোধের সঙ্গে যদি মাতামাতি করে, তবে তাহা তেমনই যুগপৎ হাস্যকর এবং করুণার উদ্রেককর ব্যাপার বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেরই মনে লাগিবে।

ফরমাইশ দিয়া ইচ্ছামত "জাতীয় সংস্কৃতি" তৈয়ারী করা চলে না। বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে যেটুকু মুসলমান প্রভাব বিদ্যমান, ধীরে-ধীরে এই পাঁচ ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া, ইসলামগত-প্রাণ পূর্ণবিশ্বাসী আলেম, মোল্লা ও মৌলবীদের চেষ্টাতেই হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ-কেহ যে ভাবে বাঙ্গালায় "ইস্‌লামী সংস্কৃতি" আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মধ্যে Positive অর্থাৎ সংগঠনকারী দিক্ অপেক্ষা Negative অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিক্‌টাই প্রবল। ইঁহাদের কাছে ইসলামীয় মনোভাব মানে, মুখ্যতঃ যাহা ভারতীয়ত্বের বা হিন্দুত্বের বিরোধী; কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব ইঁহাদের চোখে "কুফ্‌র্" বা বিধর্মিত্ব এবং "শির্‌ক্" বা বহু-দেব-বাদিত্বেরই নামান্তর। হিন্দু বা ভারতীয় মাটিতে জন্ম—এই কথাতেই যেন কুফ্‌র্ ও শির্‌ক্-এর আমেজ লাগিয়া আছে; তাই বহু ভারতীয় বা বাঙ্গালী মুসলমান নিজেকে সৈয়দ বা আরব, অথবা ইরানী, পাঠান, মোগল বা তুর্কী বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। বাঙ্গালী বা ভারতীয় মুসলমানদের এই আত্মমর্যাদাবোধ-হীনতা তাহাদের পক্ষে—এবং আমাদের পক্ষেও বটে—এক হৃদয়-বিদারক, সর্বনাশকর ট্রাজেডি। পারস্যের মুসলমানেরা কখনও এইভাবে আত্মমর্যাদা হারায় নাই; ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে পারসীকেরা নিজ জাতির আভিজাত্য, তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলিতে চাহে নাই—বরং তাহাদের "শাহ্‌নামা" গ্রন্থে, মুসলমান-পূর্ব যুগের পুরাণ-কথাকে তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তুর্কী মুসলমানেরা তিন চার শতকের বিস্মৃতির পরে, আবার নূতন করিয়া তাহাদের জাতির গৌরব-কথা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে—তুর্কীরা এখন আরব ও ইরানী প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু আসিয়াছে, এ তাবৎ তাহা বাঙ্গালীর জীবন ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রাখিয়াই আসিয়াছে। এখন কোনও-কোনও দিক্ হইতে যে নবীন প্রয়াস হইতেছে, তদ্দ্বারা ভাঙ্গন ঘটিবে—কিন্তু তাহার দ্বারা বড একটা কিছু গড়িয়া উঠিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালী মুসলমানের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন মুসলমান জাতির মনের ও সভ্যতার প্রকৃতি—এগুলিকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া, বাঙ্গালী মুসলমানের মনকে চালিত করিবার চেষ্টা করিলে, একটা কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুই সৃষ্ট হইবে, সত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হইবে না।

* * *

বাঙ্গালা দেশে যে সংস্কৃতি গত এক হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যে যে বস্তু বা অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নীচে তাহার একটা দিগ্‌দর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইয়াছে।—

[১] বাঙ্গালার বাস্তব সভ্যতা—

বাঙ্গালায় খড়ের চালের কুটীর ; পূর্ব-বঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়) ; প্রাচীন কালের কাঠের কাজ—ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটী, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে) ; ইটের মন্দির ; পোড়া-মাটির ভাস্কর্য—ইটের উপরে নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে-খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র-স্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)—ইটে-খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।

চিত্রবিদ্যা—পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), এবং অন্য প্রকারের খাঁটি বাঙ্গালী চিত্রপদ্ধতি, যথা—পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, কালীঘাটের পট, পূর্ব-বঙ্গের গাজীর পট, শরায় ছবি আঁকা—ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত; মাটীর ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চাল-চিত্র আঁকা, মাটির সঙের পুতুলে পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র—ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে; রঙ্গীন মাটীর পুতুল, কাঠের পুতুল—গ্রাম-শিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প—জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

দাঁইহাট কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্তি-শিল্প ও অন্য ভাস্কর্য, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতীর দাঁতের কারুশিল্প—মূর্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙ্গালার হাতীর দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পর্যন্ত পঁহুছিয়াছে); বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ—শাঁখে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙ্গালায় সোলার কাজ—খেলনা, ঠাকুরের সাজ; ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন, ঢাকার filgree work বা রূপার তারের কাজ; কলিকাতার রূপার repousse work বা নকশাতোলা কাজ; কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলঙ্কার-শিল্প, এবং বিলাতী ধরণের মীনার কাজ—এগুলিরও প্রভাব বাঙ্গালার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙ্গালার পিতল-কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ-খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল কাঁসা ও ভরণের বাসন, দাঁইহাট-কাটোয়ার, বনপাস-

বর্ধমানের এবং ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের নানা স্থানের পিতলের বাসন ; কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্তি-ঢালাই ; শাসপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ।

বাঙ্গালার খাদ্য-দ্রব্য—বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট শাক শুক্তানি ঘণ্ট নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তরকারী ; (বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গের) মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি ; বাঙ্গালার কাসুন্দী, ছড়া-তেঁতুল, আচার ; খেজুরে' গুড়, পাটালী ; মুড়ি, মুড়কী ; চালের গুঁড়া, নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন ; বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি ; ছানার তৈয়ারী বাঙ্গালার নিজস্ব মিষ্টান্ন, নানা প্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা।

বাঙ্গালার পরিধেয়—মিহি মলমল, ঢাকার জামদানী (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল শান্তিপুর চন্দ্রকোণা ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও সাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতী সাড়ী, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর ; বীরভূম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম ; রাজশাহীর মট্‌কা ; বীরভূম তাঁতিপাড়ার ও কড়িধার তসর ; বিষ্ণুপুরের রেশম—কেটে', চেলি, নকশা-দার ও বুটিদার সাড়ী ; অধুনা-বিলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বালু-চরের সাড়ী ; হিমালয়-প্রান্তের মোটা পশমী কম্বল ; অধুনা-প্রচলিত বাঙ্গালার ছাপা রেশমের শাড়ী।

মেদিনীপুরের সূক্ষ্ম মাদুর, কুমিল্লা নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের শীতলপাটী।

বাঙ্গালার নিজস্ব কৃষি-শিল্প—নানা প্রকারের ধান ; পান ; পাট ; বাঙ্গালার মাছের চাষ।

বাঙ্গালার নৌশিল্প—বিভিন্ন প্রকারের নৌকা (এই নৌশিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত) ; বীরভূমের বুহির্তাল, এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

[২] বাঙ্গালার অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতি—

বাঙ্গালার সামাজিক বিধি ও ধর্ম-সাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার হিন্দুর সম্পত্তি-উত্তরাধিকার রীতি—দায়ভাগ; বাঙ্গালার সামাজিকতা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি, এবং জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও মিত্র সম্মিলনের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার পূজা—দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, রাস, সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ, এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে দুর্গাপূজা; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ব্রত-কথা, ছোট-ছোট মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকা-ব্রত; পারিবারিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব—আটকৌড়িয়া, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাই-ষষ্ঠী, পৌষ-পার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নূতন-খাতা প্রভৃতি।

মেয়েদের আলিপনা-আঁকা, কাঁথা-সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙ্গালার লাঠিখেলা ও ক্রীড়া-কসরৎ; রায়বেঁশে' নাচ; পূজার সময়ে ঢাকী-ঢুলীদের নাচ; পূর্ব-বঙ্গের আরতি-নৃত্য; মেয়েদের ব্রত-নৃত্য; অন্য নানা প্রকারের নৃত্য।

বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহররমের ও শাহ্‌ মাদারের অনুষ্ঠান; নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ।

[৩] বাঙ্গালার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—

টোল-চতুষ্পাঠী; বাঙ্গালার সংস্কৃত বিদ্যা—জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীর্তি; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালিপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরম্পরা; নৈয়ায়িক ও স্মার্তগণ; আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ; মধুসূদন

সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ; বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক পদ ; বৌদ্ধ চর্যাপদ ; বড়ু চণ্ডীদাস ; শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব ; কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'; ব্রজবুলী ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলি সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ; শাক্ত পদ—রামপ্রসাদ ; রামায়ণ মহাভারতের বাঙ্গালা রূপ ; বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের উপাখ্যান—বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা ; লাউসেন-কথা (অধুনা কম প্রচারিত) ; পশ্চিম-বঙ্গের ধর্মপূজা ; বাঙ্গালার কথকতা ; কীর্তন গান—কীর্তনের অভিব্যক্তি—গড়েরহাটী বা গরাণহাটী, মনোহরশাহী, রাণীহাটী, প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন ; বাউল ও ভাটিয়াল গান ; বাঙ্গালার শ্লোক-পড়ার সুর ; কবি, ঝুমুর, তরজা ও অন্য গ্রাম্য-গীত ; পাঁচালী ; বাঙ্গালার 'যাত্রা' ; জারি গান ; মুসলমান মারফতী গান, মর্সিয়া গান ; বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান পুঁথি-পড়ার সুর ; বাঙ্গালার পয়ার; পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী গানের বাঙ্গালায় প্রচার—বাঙ্গালার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রী, ঢপ, খেম্‌টা।

বাঙ্গালার সাহিত্য—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', চৈতন্য ও বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্রবিষয়ক পুস্তক, পদাবলী-সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্গালার কাব্যাবলী (মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি) ; ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু—গীতি-কবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া, ইংরেজদের আগমন পর্যন্ত বাঙ্গালার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধুনা ইহার কতকগুলি বিষয় একেবারে লোপ পাইয়াছে, কতকগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং কতকগুলির আমরা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছি। ইংরেজ-আমলে বাঙ্গালা কতকগুলি, নূতন জিনিসে, তথা এই প্রাচীন জিনিস-গুলির অনেকগুলিতে, সমগ্র ভারতের দ্বারায় স্বীকৃত বিশেষ কৃতিত্ব

প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক কালের বাঙ্গালীর সংস্কৃতির পরিচয়-স্বরূপ বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর মধ্যে উল্লেখ করা যায়—

[১] বাঙ্গালার ব্রহ্ম ধর্ম—রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী।

[২] বাঙ্গালায় হিন্দুধর্মের নবীন জাগৃতি—রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভূদেব, বিজয়কৃষ্ণ, হীরেন্দ্রনাথ। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া জনসেবা—ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মিশন।

[৩] আধুনিক বাঙ্গালার সংস্কৃত-চর্চা—রাধাকান্ত দেব, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পঞ্চানন তর্করত্ন, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্তরত্ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ।

[৪] বাঙ্গালার সাহিত্য—ঈশ্বরচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র।

[৫] বাঙ্গালার নবীন শিল্প-পদ্ধতি—ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধার চেষ্টা—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ।

[৬] রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বাঙ্গালা সঙ্গীতের নূতন ধারা; শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং অন্যত্র উদয়শঙ্কর প্রভৃতি বাঙ্গালী নৃত্যকলাবিদ্‌গণের দ্বারা প্রবর্তিত ভারতীয় নৃত্যের নূতন ধারা।

[৭] বাঙ্গালার সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা ও সংরক্ষণ-চেষ্টা—রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র।

[৮] বাঙ্গালায় আরব্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং বঙ্কিম-প্রমুখ বাঙ্গালী কর্তৃক ভারত-মাতার কল্পনা। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যাত্রামোহন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

[৯] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের গবেষণা—আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ।

[১০] বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক সার্থক গবেষণা—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, শরৎচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে একাধারে পাণ্ডিত্য ও কৃতকারিতার অভাব নাই, তাহা আধুনিক বাঙ্গালার "বাচস্পত্য" সংস্কৃত অভিধানের সংকলয়িতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং বাঙ্গালা "বিশ্বকোষ"-কার নগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

* * *

প্রসঙ্গতঃ বিশিষ্ট বাঙ্গালী সংস্কৃতির কতকগুলি লক্ষণীয় অঙ্গ বা উপজীব্য বস্তু, অনুষ্ঠান ও প্রকাশের উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালার সংস্কৃতির গতির দিগ্‌দর্শনে ফিরিয়া আসা যাউক।

মোগল যুগের মধ্যেই, বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়—পোর্তুগীস, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ—আসিল। ইংরেজ ধীরে-ধীরে

দেশের রাজা হইয়া বসিল। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে, ইংরেজের সহিত সাহচর্যের ফলে, আর একবার যুগান্তর উপস্থিত হইল।

এই যুগান্তর এখনও চলিতেছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত, এই যুগান্তর ব্যাপারে আমরা চারিটী পর্যায় বা ক্রম দেখিতে পাই। [১] রামমোহনের যুগ, [২] "ইয়ং-বেঙ্গল"-এর যুগ, [৩] বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দের যুগ, ও [৪] অতি আধুনিক যুগ, বা লড়াইয়ের পরের যুগ।

[১] প্রথম যুগে ইউরোপীয় মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয়। এই প্রথম পরিচয়ের সময়ে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন একটু সাবধানতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, একেবারে নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাহে নাই। রামমোহন এই যুগের প্রতীক। ইনি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের উর্ধ্বে উঠিতে না পারিলেও, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সার কথা উপনিষদ্‌কে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, উপনিষদেই ইহার পর্যবসান নহে,—এই বোধ আংশিক ভাবে রামমোহনের ও পরে তাঁহার বহু অনুগামীদের মনে না থাকায়, রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জস্য একদেশদর্শী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্য-যুক্ত চিত্তের মানুষ না যাওয়ায়, রামমোহন এদেশের মন যাহা চায়—তদনুরূপ ঈশ্বরে একান্ত-ভাবে নিমজ্জিত লোকপূজিত ধর্মগুরু হইতে পারিলেন না।

[২] দ্বিতীয় যুগে, বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে ইহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা নানা উপায়ে ইউরোপীয়

মনোভাব—এমন কি ইউরোপীয় রীতিনীতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালী—সমস্তই ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিতে চাহিলেন। এরূপ উলট-পালট করিবাব মত সংখ্যা বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না ; কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত অথবা ইংরেজী-শিক্ষাকামী জনগণের মনে তাঁহার একটী ছাপ দিয়া গেলেন।

[৩] তারপরে আসিল যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা—এই চেষ্টায় ছিল—প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাকে রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহা আত্মসাৎ করা। বঙ্কিম, ভূদেব ও বিবেকানন্দের যুগে—অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৬০ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত—জীবন ধীর-মন্থর গতিতে চলিতেছিল ; ইউরোপীয় সভ্যতা আজকালকার মত এতটা সর্বগ্রাসী ভাবে আমাদের সমক্ষে তখন দেখা দেয় নাই, আমাদের জীবনে আজকালকার মত এত জটিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও আসে নাই। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধীরে-সুস্থে বিচার করিবার অবকাশ ছিল, তাই আমরা বঙ্কিমে ভূদেবে বিবেকানন্দে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে হিতকর—তাহার সংহতি-শক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযোগী এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার যোগ্য—কথা পাই ; সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলিয়াই বঙ্কিম ও মধুসূদন বাঙ্গালীর জন্য এমন চিরন্তন রস-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

[৪] এমন বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে যুগ চলিতেছে, তাহার মূল কথা হইতেছে—বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত, বাঙ্গালীর জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন, এবং আদর্শ-বিপর্যয়। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বনাশকর হিন্দু-মুসলমান বিরোধও;

এই যুগের চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক অবনতির একটা প্রধান কারণ। এখনকার কালে চারিদিক হইতে ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িতেছে। এই যে দ্রুত ভাব-বিনিময়,—সংবাদপত্রের ও সাহিত্যের বহুল প্রচার, চলচ্চিত্র ও সবাকৃচিত্র প্রভৃতির যুগে এরূপটী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক অবস্থা-বৈগুণ্যে বাঙ্গালীর সামাজিক আদর্শও পরিবর্তিত হইতেছে; প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ, যাহা এতাবৎ কন্যাপণ ও কন্যার সংখ্যাল্পতা হেতু নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, অর্থনৈতিক সঙ্কটে বেশী করিয়া ক্লিষ্ট হওয়ায় তাহা মধ্যবিত্ত ঘরেও আসিয়া পড়িতেছে; অকৃতদার পুরুষ, ও অবীরা বা কুমারী নারী,—নূতন যুগের এই বৈশিষ্ট্য বহুশঃ বাঙ্গালী সমাজেও পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও হইবে। সহশিক্ষা-রূপ নূতন সমস্যাও আসিতেছে।

বুদ্ধিমান্ জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। পূর্বে বিচারিত আধুনিক যুগান্তরের কালের তৃতীয় যুগে অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৪০ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত, বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের আনুগত্য করিয়া আসিতেছে; ইংরেজের বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তাহার অর্থ-নৈতিক সঙ্কট হয় নাই, সে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ জুড়িয়া বড় চাকুরী ও প্রভূত সম্মান, উভয় পাইয়া আসিয়াছে। অখ্যাত, অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত, সুদূর প্রান্তিক প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া দিল্লীতে বা অন্যত্র পাঁচজনের সমাজে, এতাবৎ বাঙ্গালী বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ইংরেজের অনুচর হইয়া এবং রাজধানী কলিকাতার অধিবাসী বলিয়া, এখন সে এক অতি উচ্চ স্থান দখল করিয়া বসিল; ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ মাথা-গরমও হইল। তাহার সে সুখের দিন আর নাই। এখন সে বাহির হইতে বিতাড়িত হইতেছে; অন্নাভাবে তাহাকে নিজ বাসভূমেও পরবাসী হইতে হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু এতদিন ধরিয়া যে সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়িয়া

তুলিয়াছিল, যাহার গঠন-কার্যে বাঙ্গালী মুসলমানেরও সাহচর্য ছিল, সেই সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মূলোৎপাটনের চেষ্টা হইতেছে—নূতন প্রচারিত বিধ্বংসন-ধর্মী সাম্প্রদায়িক মুসলমান মনোভাবের ফলে। এ পর্যন্ত বাঙ্গালী নিজেকে যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সে শিক্ষা তাহার আর জীবনে কার্যকরী হইতেছে না; সে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে নিজের বৃত্তি ও নিজের জীবন-যাত্রার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিতেছে না, কেবল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। দেশে তেমন বড় চিন্তানেতা নাই; যিনি তাহাকে যথার্থ দিগ্‌দর্শন করান, তাহার কর্তব্য বলিয়া দেন, বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানে তাহাকে পরিচালিত করেন।

এই অবস্থার মধ্যেও শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার জন্য লালায়িত—কেবল যা তা সাহিত্য নহে—বড় সাহিত্য। জাতির মধ্যে স্ফূর্ত জীবনী-শক্তি, অদম্য আশা, অটুট কর্মশীলতা না থাকিলে, সে জাতির মধ্যে কি প্রকারের সাহিত্য জন্মলাভ করিবে? এই যুগের পূর্ববর্তী কালের দুই চারিজন সাহিত্যরথী বিদ্যমান, তাঁহাদের লইয়াই আমরা গৌরব করি; কিন্তু যুগ-ধর্মের ফলে বাঙ্গালীর অতি-আধুনিক সাহিত্য-চেষ্টা (অল্প দুই এক জন প্রতিভাশালী লেখককে বাদ দিলে) ব্যর্থতার একটী হৃদয়-বিদারক প্রকাশ মাত্র।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং তাহার কৃতিত্ব বিচার করিয়া, উপস্থিত সঙ্কট-কালে তাহার মানসিক চর্চা সম্বন্ধে এই কয়টী কথা বলা যায়—

[১] বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ জাতি, ইহা সত্য বটে,—কিন্তু এই ভাব-প্রবণতাই তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। বাঙ্গালী লক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি

করিয়াছে ; কিন্তু সেই সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব কিছু বস্তু নহে ;— তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পদ এবং কতকগুলি আখ্যায়িকা, এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধুসূদনের কাব্যাংশ, বঙ্কিমের খানকয়েক উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতা, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ ও অন্য রচনা—মাত্র এই কয়টী জিনিস আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিতে পারি। ভাটিয়া বা মারোয়াড়ী, অথবা পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছে না ; ইহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য অমনিই সিদ্ধান্ত করা হইল, বাঙ্গালী কবি জাতি, ভাব-প্রবণ জাতি, তাহার মধ্যে কর্মশক্তি নাই, তাহার উৎসাহ ও উদ্যোগের সমস্তটাই ভাবুকের খেয়ালে, কবির কল্পনায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরাও এই কথাটা যেন পাকে-প্রকারে মানিয়া লইয়াছি ; রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে, আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ সচেতন গৌরব-বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, একটা গর্ব-সুখে আমাদের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান কার্যতঃ ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-সঙ্গীত রূপে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মারোয়াড়ীর মত কৃতিত্ব আমাদের মধ্যে না দেখিয়া, সকলেই আমাদের কল্পনা-শক্তিরই তারিফ করিতেছে ; আমরাও সেই কথা সত্য ভাবিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতেছি,—আমাদের ব্যর্থতাকে আমরা কেবল আমাদের প্রতিকূল অবস্থা অথবা দৈব-দুর্বিপাক হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহার প্রতিকারের শক্তিকে খর্ব করিতেছি। আমাদের দেশের নেতারা কেহ-কেহ সাহিত্যে, কীর্তনের গানে, আমাদের ভাবুক প্রাণের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কবিতা ও গান, ইহাই যেন হইল আমাদের মানসিক সংস্কৃতির চরম

ফল। বার-বার একটা কথা শুনিয়া, সেই কথা ক্রমাগত মন্ত্রের মত জপ করিয়া, আমরা সেই কথাটাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিক এই কথাটাই কি ঠিক? আমরা কি কেবল ভাব-প্রবণ জাতি? আমাদের মধ্যে কি জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সার্থকতা নাই—হয় নাই? আমার মনে হয়—ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা, সাহিত্য-রসে মশগুল হইয়া থাকা—ইহা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক্ মাত্র—ইহা সর্বপ্রধান দিক্‌ও নহে। প্রাচীনকালে কীর্তনের সভায় ও কবি বা পাঁচালী গানের আখড়ায়, বাউলের জমায়েতে ও মারফতী গানের মজলিসে যেমন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলে এবং বিচার-সভায় তাহার জ্ঞানের দিক্‌টা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞান-মন্দিরে বাঙ্গালী রিক্ত-হস্তে যায় নাই। ভারতের সঙ্গীতোদ্যানে বাঙ্গালা কীর্তন্ একটী বিশিষ্ট সুরভি পুষ্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙ্গালার নব্য ন্যায়, বাঙ্গালার সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী; বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী, এবং আধুনিক কালে বাঙ্গালার রামমোহন, বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার কেশবচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী গবেষক, প্রত্ন-তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাড়াইতেও ভারতের চিন্তাকে পুষ্ট করিতে ইঁহাদের দান কম নয়; ইঁহারা বাঙ্গালার মানসিক সংস্কৃতির অপর একটী দিক্—এবং একটী বড় দিক্,—নিছক ভাব-প্রবণতার অত্যাবশ্যক প্রতিষেধক দিক্‌কে প্রকাশ করিয়া আছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর এখন জীবন-মরণ সঙ্কট উপস্থিত; আমাদের ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা সবই শুখাইয়া যাইতেছে এবং অন্নের অভাবে তাহা আরও শুখাইয়া যাইবে। জাতির জীবনের স্ফূর্তি, আশা, আনন্দ, উৎসাহ, জয়ের আগ্রহ না থাকিলে, সেই জাতির মধ্যে

সত্যকার প্রাণবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন সাহিত্য-সৃষ্টির সাহিত্য-চর্চার চেষ্টা, কল্পনার আবাহন, ভাবুকতার সাধন, —সে যেন যে গাছের গোড়া শুখাইয়া আসিতেছে, শিকড়ে যাহার রস নাই, সেই গাছের আগ-ডালে বারি-সেচন করা। আমাদের জীবনে ভোগ করিবার, ত্যাগ করিবার কি আছে? অর্জন করিবার, জয় করিবার কি আছে? যেটুকু আছে, তাহা তো রক্ষা করিবারও পথ পাইতেছি না। এ অবস্থায় কি প্রকারের সাহিত্য আমাদের হাত দিয়া বাহির হইতে পারে? বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিয়াছে; রসচর্চা লইয়া মাতামাতি করা এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অশোভন দেখায়। এখন প্রাণধারণের, দুর্দিনের রাত্রে কোনও রকমে টিঁকিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন তাহাকে সব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এখন তাহার আত্মবিশ্লেষণ কার্যে তাহাকে জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির আবাহন করিতে হইবে; সে শক্তির পরিচয় সে দিয়াছে, সে শক্তি তাহার আছে, এবং সে শক্তি তাহার কল্পনা বা ভাবুকতা হইতে কোনও অংশে কম নহে।

[২] প্রত্যেক সমাজের মধ্যে দুই প্রকারের শক্তি কার্য করে— কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসারী, আত্মসমাহিতকারী এবং আত্মপ্রসারকারী; এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালী সম্প্রতি একটু বেশী রকম করিয়া বহির্মুখী হইতে চাহিতেছে। এখানে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া তাহাকে একটু অন্তর্মুখী করা, এখন তাহার প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুরণের দোহাই দিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ স্বাধীন গতি এই কেন্দ্রাপসারিত্বের একটা বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু সমাজ-গত সমষ্টির বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ ব্যক্তি-গত ব্যষ্টি, যদি এই রূপে মুক্ত, স্বতন্ত্র ও সংঘ-বিচ্যুত

হইয়া অবাধ গতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ-সমষ্টি আর সমষ্টি-বদ্ধ থাকে না। এক কথায়, Social Discipline বা সমাজগত চর্যা বা নীতি বা বিনয় না থাকিলে, সমাজ ও জাতি টিঁকিতে পারে না। এখন বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের অবাধ প্রসারের সময় ইহা নয়; একমাত্র সংঘ-গতভাবে অবস্থান দ্বারাই ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন ও স্বার্থ উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালীর জীবনে এখন এই রক্ষয়িত্রী শক্তির উজ্জীবন করিতে হইবে,—আবার সমাজকে, সঙ্ঘকে, জাতিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। কি ভাবে এ কার্য করা উচিত, তাহা অবশ্য বিচার-সাপেক্ষ। রক্ষয়িত্রী শক্তি অর্থে নিছক গোঁড়ামি নহে। দেশ ও কালের উপযোগী ভাবে, নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে বিচ্যুত না হওয়াই হইতেছে সামাজিক জীবনে কার্যকর রক্ষণশীলতা। এ কাজের জন্য প্রথম আবশ্যক—জ্ঞান, আলোচনা, অনুশীলন; নিজের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে, এবং বাহিরের জগতের প্রগতি বিষয়ে। বাঙ্গালীকে আবার একটা বাঁধা-ধরা discipline মানিতে হইবে—'ন্যায়-আঁকড়িয়া' হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে রাশ ছাড়িয়া দিলে,তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিতে হইবে।

[৩] বাঙ্গালী কর্মী নহে, তাহার এই একটা অপবাদ আছে। সত্য বটে; হাজারে-হাজারে লাখে-লাখে বাঙ্গালী অন্ন-উপার্জনের জন্য বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালার বাহিরে যায় নাই—যেমন পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালায় আসিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, এতাবৎ বাঙ্গালীর ঘরে একমুঠা ভাতের অভাব হয় নাই। সেদিন পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের অন্নচিন্তা ছিল না। গরীব লোকে দেশে বসিয়াই পেট

ভরাইতে পারিত, বা আধ-পেটা খাইয়া কোনও রকমে থাকিতে পারিত, ১৫।২০ টাকার জন্য কাঁচা মাথা দিবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না, 'রুটী-অর্জন' করিতে তাহাকে বাহিরে ছুটিতে হইত না। এখন সে আবশ্যকতা আসিতেছে। আমার মনে হয়, তথাকথিত ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী, কবি বাঙ্গালী, এখন দরকার পড়িলে কর্মী বাঙ্গালী হইতে পিছপাও হইবে না। আবশ্যকতা পড়িয়াছে বলিয়াই ময়মনসিংহের বাঙ্গালী কৃষক এখন ঘর ছাড়িয়া আসাম প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্মা ও শ্যামে গিয়া বসবাস করিতেছে। দেখা গিয়াছে, কার্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী অন্য জাতির লোকেদের চেয়ে কিছু কম কৃতিত্ব দেখায় নাই। মানুষের কর্ম-শক্তি তাহার আভ্যন্তর urge বা তাড়নার উপরে নির্ভর করে। বাঙ্গালীর অবস্থা-বৈগুণ্যে সে তাডনা আসিতেছে। বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া শ্রমী ও কর্মী হইতেই হইবে। 'তুমি কবি ও ভাবুকের জাতি, তোমার দ্বারা এসব কিছু হইবে না',—এইরূপ নিরুৎসাহ-বাক্যে তাহার শত্রুরাই তাহাকে নিবৃত্ত করিবে।

[৪] বাঙ্গালীর বাঙ্গালীপনার বা বাঙ্গালীত্বের দিকে ঝোঁক দিয়া কেহ-কেহ তাহাকে অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার মনে শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মতন শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই—প্রমাণ, বাঙ্গালী পটুয়ার পট, বাঙ্গালী ছুতারের কাঠ-খোদাই, মধ্য-যুগের বাঙ্গালার ইটে-কাটা মন্দিরের নক্‌শা; বাঙ্গালীর নাচ অপূর্ব —প্রমাণ, বাঙ্গালীর মল্ল-নৃত্য, রায়-বেঁশে নাচ, বাঙ্গালার কোনও কোনও জেলার মেয়েদের মধ্যে বিলোপ-শীল ব্রত-নৃত্য। আমাদের দেশের গ্রাম-শিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসিব,যতটা সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিব; এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটী মনোহর অভিব্যক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া, জগতের অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর

জিনিসকে টেক্কা দিয়াছে আমাদের বাঙ্গালার এই শিল্প ও সৌন্দর্য-সৃষ্টি, এরূপ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর মুখে হাস্যের উদ্রেক করিবে। সাহিত্যে একজন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতা অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই বলিয়া যেমন ইহা প্রমাণিত হয় না যে বাঙ্গালী মাত্রই কবি, তেমনি একজন অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল ভারতীর নিজ হস্ত হইতে তুলিকা পাইয়াছেন বলিয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিল্প-বিষয়ে অসাধারণত্ব সূচিত হয় না।

আমরা ভারতের আর পাঁচটী জাতির মতই একটী প্রধান ভারতীয় জাতি। আমাদের ভাবুকতা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্প-বোধ আছে; ভারতের সভ্যতার ভাণ্ডারে হাত পাতিয়া আমরা কেবল লই নাই, দিয়াছিও যথেষ্ট; আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও আবিষ্কার, আমাদের হিন্দু-যুগের ও মধ্য-যুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য, পট ও ইটে-খোদাই,—এসব গর্ব করিবার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনও-কোনও বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে, ও করিবে; এইখানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা। আমরা অনুচিত গর্ব করিতে চাহি না; তবে যে কোনও অবস্থায় আমরা যে অকৃতকার্য হইব না, আমরা পূর্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শেষ এই কথা বলি—অনার্য এবং আর্য পিতৃপুরুষ ও সংস্কৃতি-গুরুদের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালীরা যে মনঃ-প্রকৃতি পাইয়াছি, তাহা নিন্দার নহে; আমাদের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিক ও ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়িয়া

উঠিয়াছে, তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং রসানন্দের দিকে ঝোঁক না দিয়া, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞান ও কর্মের দিকেই বেশী করিয়া ঝোঁক দিতে হইবে—ইহাই আমার নিবেদন॥

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

চল্লিশ বৎসর হইল, পুণ্যশ্লোক ভূদেবের পরলোক-গমন হইয়াছে। —কোনও প্রভাবশীল ব্যক্তি আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকিলে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া বা তাঁহার কৃতিত্বের পূরা পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়। অর্ধ-শতাব্দীর অধিক-কাল হইল, প্রবন্ধ দ্বারা এবং আপনার জীবনের আচরণ দ্বারা ভূদেব বাঙ্গালী হিন্দুর সমক্ষে একটী আদর্শ ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের কার্যকারিতা এবং তাহার মধ্যে নিহিত চিন্তাপ্রণালীর সারবত্তা বিচার করিয়া দেখিবার সময় এখন আসিয়াছে। ভূদেব, আর দশজন বাঙ্গালীর মধ্যে একজন বাঙ্গালী থাকিয়াই, নিজেকে সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে নিমগ্ন রাখিয়াই জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে যাহা-কিছু ভাল এবং যাহা-কিছু মন্দ আছে, ইহার মধ্যে গৌরবের এবং নিন্দার যাহা-কিছু আছে, সেই ভাল-মন্দ এবং নিন্দা-গৌরব সমেত এই জীবনকে মানিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে থাকিয়া, নিজের জ্ঞান-গোচর মত এবং চিন্তা ও অভিজ্ঞতা মত সেই জীবনকে

পূত ও সংস্কৃত, সবল ও ঘাত-সহ করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। নিজ জাতিকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার মৌলিক প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহার হিত-সাধনে আত্ম-নিয়োগ করা—এই ব্যাপারে একাধারে তাঁহার স্বাজাত্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও আত্মনির্ভরশীল বীরত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূদেবের জীবনে চটকদার ও চমকপ্রদ কিছুই ঘটে নাই। তিনি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের সন্তান ছিলেন, পৈতৃক ব্যবসায় ছিল যাজন ও অধ্যাপনা। শিক্ষা-সম্পর্কীয় কার্যেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন, এবং তাঁহার উপজীব্য ব্যবসায়ই দেশ ও সমাজ-সেবার ব্রতে তাঁহার মুখ্য সাধন-স্বরূপ হইয়াছিল। উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত যথার্থ ব্রাহ্মণ পিতার হাতে মানুষ হইয়া, প্রতিভাশালী বালক ভূদেব বিদ্যা-অর্জনে কৃতিত্বের পরিচয় দেন—আর পাঁচজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী ছেলেরই মত। কিন্তু প্রথম হইতেই তাহাদের চেয়ে তাঁহার চরিত্র-গত একটু বৈশিষ্ট্য, একটু লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাহার পরে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করেন, ও তদনন্তর শিক্ষাবিভাগে পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে ভারতবাসীর ভাগ্যে যতটা উচ্চ পদ পাওয়া সম্ভব ছিল, তাহা অপেক্ষাও উচ্চ পদ নিজ যোগ্যতা-বলে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-বিভাগের মুখ্য পরিচালক রূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার কথাও হইয়াছিল। কেবল উচ্চ পদ হেতু তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবনের গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব ছিল, বাস্তবতঃ ততটুকু তিনি করিয়াছিলেন; কিন্তু উপদেশ দ্বারা এবং নিজ চারিত্র্যের প্রমাণ দ্বারা তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক

অধিক কাজ করিয়াছিলেন—যদিও তাঁহার দেশ ও সমাজ, কাল-ধর্মের ফেরে, তাহা পূর্ণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ যুগে, ইহার পরবর্তী যুগের (অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথম পাদ বা প্রথমার্ধের) বাঙ্গালী জীবনের ধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়। যে ভাবে সকলের জ্ঞাত-সারে ও অজ্ঞাত-সারে এই নিয়ন্ত্রণ-কার্য ঘটে, তাহাতে অনুকূল এবং প্রতিকূল দুই দিক্ দিয়া ভূদেব অংশ গ্রহণ করেন। যে সকল মনীষীর হাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক বাঙ্গালীর (অতি আধুনিক তথা-কথিত তরুণ বাঙ্গালীর নহে) চরিত্র ও চিন্তাধারা মুখ্যতঃ যাঁহাদের আদর্শে ও ভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, ভূদেব তাঁহাদের অন্যতম। ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে আর তিনজনের নাম করিতে পারা যায়—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ।

ভূদেব বিলাতে যান নাই—সিভিলিয়ান বা ব্যারিস্টার হইয়া আসেন নাই। Sensational অর্থাৎ রোমাঞ্চকর কিছু করিয়া বসেন নাই। নিজ সমাজের বা জাতির মধ্যে, আদর্শ এবং আচরণের মধ্যে বহুপ্রকার অসঙ্গতি দেখিয়া, বীররস দেখাইয়া, নাটুকে' কায়দায় স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের অভিশাপ আবাহন করেন নাই—রূপক-চ্ছলে বা বাস্তব-রূপে পৈতা ছিঁড়িয়া সমাজের উপরে পদাঘাত-পূর্বক সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়া, অন্যত্র আত্মবিসর্জন করেন নাই। আবার সমাজ বা জাতির সম্বন্ধে একেবারে উদ্দেশ্যহীন হন নাই; কেবল ব্যক্তিত্বের দোহাই পাড়িয়া, cynic ('শ্ব-বৃত্ত') অর্থাৎ সমদর্শীর ভাণে নিন্দা-বৃত্ত হইয়া, নিরপেক্ষ দর্শক বা বিচারকের উচ্চাসনে বসেন নাই, এবং কেবল বচন ও টিপ্পনী কাটিয়াই সমাজের প্রতি নিজ কর্তব্যের সমাধা

করেন নাই। সমাজ-ত্যাগী, এবং স্বকীয় অধঃপতিত সমাজ সম্বন্ধে cynic, এই দুইটী বিপরীত চরিত্রের প্রথমটীতে যে বাহাদুরীর আভাস আছে, তদ্দর্শনে কখনও কখনও আমাদের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগে; দ্বিতীয়টীর সহিত পরিচয়ে, অনেক সময়ে উহার বাহিরের চটকের মোহে আমরা পড়িয়া যাই, আমাদের নিজেদের বোধ ও বিচার-শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাই—cynic-এর মনোভাব সাধারণ জনতার মনোভাবের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, ইহা আমাদের মনে একটা ভয় আনিয়া দিলেও, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এই দুই প্রকারের চরিত্রের মধ্যে যে একটু সূক্ষ্ম vulgarity বা ইতরামি আছে তাহা বুঝা যায়। ভূদেবের জীবনে ও চরিত্রে এই দুই প্রকারে তাক্ লাগাইয়া দিবার কিছু ছিল না বলিয়া, এবং নিজের ও নিজ পরিজনের জীবনযাত্রার সুনিয়ন্ত্রণের ফলে, কর্ম-জীবনে তাঁহাকে কখনও অভাবগ্রস্ত হইতে হয় নাই বলিয়া, successful bourgeois অর্থাৎ 'অর্থাগম ও প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় কৃতকার্য বুদ্ধিজীবী' এই আখ্যা দিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে নাসিকা-কুঞ্চন পূর্বক তুচ্ছতা-পূর্ণ উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। ভূদেবের জীবন ও তাঁহার লেখার সহিত পরিচয়ের, তথা ভূদেবের সময়ের বাঙ্গালী সমাজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আলোচনার অভাবই এইরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ এবং অনুচিত উক্তির কারণ।

ভূদেবের কৈশোর ও যৌবনকাল বাঙ্গালীর পক্ষে এক বিষম সময় ছিল। তখন ইংরেজী সভ্যতার প্রথম বড় ধাক্কা বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে—সেই ধাক্কা অনেকেই সামলাইতে পারিতেছিল না; ইংরেজী শিখিয়া অনেক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান, ইউরোপীয় সভ্যতা ও মনোভাবের কাছে যতটা না হউক, ইউরোপীয় রীতি-নীতি ও আদব-

কায়দার কাছে আপনাকে একেবারে বিকাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। ১৮৪০ হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই ভাবটা প্রবল ছিল। এই সময় কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির আব-হাওয়া বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ-রূপে কল্যাণকর ছিল না। একদিকে যেমন ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি বাঙ্গালীর মনে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা এবং নবীন প্রেরণা আনিতেছিল, অন্য দিকে তেমনি তাহার নূতন শিক্ষা তাহাকে নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ করিয়া রাখিতেছিল, এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসহীন করিয়া তুলিতেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে এই সহায়হীনতার ভাব, এই জাতীয় মর্যাদা-বোধের অভাব, বাঙ্গালীর পক্ষে সব চেয়ে বড় দুঃখের ও লজ্জার কথা ছিল। ইংরেজের অধীনে আমরা; বুদ্ধিতে, শক্তিতে ও সঙ্ঘবদ্ধতায় ইংরেজ আমাদের অপেক্ষা উন্নত; ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানও আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। আবার ইহার উপর সমগ্র সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও যদি ইংরেজের রীতি-নীতি আমাদের অপেক্ষা উন্নততর ও শোভনতর বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই, তাহা হইলে কিসের উপরে আমাদের জাত্যভিমান, আমাদের আত্মমর্যাদা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? জাত্যভিমানের অভাব—ইহার অর্থই হইতেছে, সমষ্টি-গত ভাবে জাতির তাবৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে আত্মসম্মানের অভাব। নিজ জাতির সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার রীতি-নীতি সম্বন্ধে কোন খবর রাখি না বলিয়াই, সেগুলি আমাদের কাছে uncouth বা অজ্ঞাত থাকে এবং কুৎসিত বলিয়া প্রতিভাত হয়, বিদেশী রীতি-নীতির সমক্ষে সেগুলিকে হীন বলিয়া বোধ হয়—মনে-মনে নিজ জাতির জন্য সদাই একটা 'কিন্তু-কিন্তু' ভাব, একটা inferiority complex অর্থাৎ

আত্মশ্লাঘবপূর্ণ ধারণা আসিয়া যায়। সত্যকার মনুষ্যত্ব-অর্জনের পথে ইহা একটা দুরপনেয় অন্তরায়। অনেকেই এই কথাটা বুঝিতেন না। অথবা বুঝিয়া, তদনুসারে কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা পরিচালিত করিতে পারিতেন না। তাই ভারতীয় হিন্দুর মত একটী সুসভ্য ও সাত্মাভিমান জাতির যুবকেরা, সবদিকের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করিত।

কিন্তু জাতির পক্ষে ইহা চরম রক্ষার কথা ছিল যে, সকলেই এই নবীন স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই;—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অনুশীলন ও সমাজ-গত আচারনিষ্ঠতাকে আশ্রয় করিয়া থাকায়, অনেকে বাহির হইতে আগত এই ভাব-বন্যায় অবগাহন কবিয়া স্নান করিলেও, ইহার স্রোতে কুল-ভ্রষ্ট হইয়া বহিয়া যায় নাই, তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছিল। ভূদেবেরও অবস্থা তাঁহার সতীর্থ বহু ছাত্রের ন্যায়ই হইত, কিন্তু তাঁহার পিতার ঔদার্য, পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা তাঁহাকে প্রথম হইতেই রক্ষা করিয়াছিল।

•

ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘাতের ফলে, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ কতকটা ভগ্ন হইলেও একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া যায় নাই। 'বঙ্গ-দর্শন' লইয়া বঙ্কিম দেখা দিলেন; প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার স্বপক্ষে হোরেস্ হেমান্ উইল্‌সন্, মাক্স্ ম্যুলর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ দু'কথা বলিলেন, স্বদেশে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ও পরে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনস্বী পণ্ডিত, বাঙ্গালীর লুপ্তপ্রায় আত্মমর্যাদা ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্ধমানের মহারাজা—ইঁহাদের চেষ্টায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের দুইটী অনুবাদ হইল। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সানুবাদ রামায়ণ প্রকাশ করিলেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির মূল সংস্কৃত উৎস হইতে বাঙ্গালী প্রাণবারি সংগ্রহ করিতে লাগিল। কর্ণেল টড্-এর রাজস্থানের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে হিন্দুর মধ্যযুগের বীরগাথা পড়িয়া বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাসও যেন কতকটা ফিরিয়া আসিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয় ও পাঠক্রম নির্ধারিত হইল, সংস্কৃত ভাষা পাঠ্য-বিষয়-সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইল। কেবল, ইংরেজী শিক্ষা হইলে যে একদেশদর্শিতা হইত, ইহার দ্বারা তাহার প্রতিষেধক মিলিল। ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ও প্রতীক হইতেছে সংস্কৃত ভাষা; 'ব্যাকরণের উপক্রমণিকা,' 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' ও 'ঋজুপাঠ' লিখিয়া, সংস্কৃত-চর্চাকে সহজ করিয়া দিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালী হিন্দুর এক মহান্ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই সব আলোচনা ও অনুশীলন আসিয়া পড়ায়, বাঙ্গালী হিন্দু ইউরোপের সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘাতের ফলে যে মোহ দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে কাটাইয়া উঠিল। ইউরোপীয় রীতি-নীতি ও মনোভাব, যতটা তাহার জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাইল, ততটা সে আত্মসাৎ করিয়া লইল। কিন্তু এই আত্মসাৎকরণের মধ্যেই ভবিষ্যতে আবার নূতন করিয়া ইউরোপীয় শিক্ষার ক্রিয়ার বীজও উপ্ত রহিল।

এই সময়ে ভূদেবের কর্মজীবন, তাঁহার প্রৌঢ় ও পরিণত জীবন; ভূদেব স্বয়ং প্রথম পুরুষের Young Bengal-এর মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছেন; বংশমর্যাদা-বোধ এবং পিতার চারিত্র্যের প্রতি ভক্তি,—এই দুইটী জিনিস তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত হইতে দেয় নাই।

পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে, এবং রাজ-কার্য-ব্যপদেশে জাতীয় জীবনে, তাঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা

তিনি প্রস্তাব ও প্রবন্ধের সাহায্যে দেশবাসিগণকে জানাইতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যা-গুলি নিপুণ ভাবে দেখিয়া, সেই-সকল সমস্যা ও সেগুলির সমাধানও তিনি অপূর্ব সুন্দর ভাবে দেশবাসিগণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে অনেকেরই চোখ ফুটিল,—অনেকের মনে স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগিল। বঙ্কিম, ভূদেব, ও পরে বিবেকানন্দ, মুখ্যতঃ এই তিন জনের চেষ্টায় বাঙ্গালী হিন্দু অনেকটা আত্মস্থ হইতে পারিয়াছিল।

উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের আরম্ভ, বাঙ্গালীর জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণের পরে একটা নূতন যুগ আবার আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগের প্রথম দশকের পর হইতে, এবং বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের পর হইতে, ইউরোপীয় প্রভাব আবার নূতন মূর্তিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে, এবং বাঙ্গালীর তথা অন্য ভারতবাসীর সভ্যতা ও জাতীয়তার সৌধের উপরে প্রবলবেগে আঘাত দিয়া, ইহাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ এই ১৯৩৪ সালে যদি বাঙ্গালীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, নানা ব্যাপার দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বহু নূতন অভিজ্ঞতা আসিয়াছে; পুরাতনের বন্ধন আরও শিথিল হইয়া আসিতেছে; এবং বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্যই হউক, বা অকল্যাণের জন্যই হউক, বহু নূতন বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি, নানা নূতন ও বিচিত্র উপায়ে ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার দরজায় হানা দিতেছে।

রক্ষণশীল মনোভাব অবলম্বন করিলে বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষার যে খাল কাটা হইয়াছিল, সেই খালের মারফৎ প্রথম যুগে পণ্য-

সম্ভারপূর্ণ বহু অর্ণবপোত বাহির হইতে আসিয়া বাঙ্গালীর জীবনের ঘাটে ভিড়িয়াছিল, এবং এখনও ভিড়িতেছে; কিন্তু সেই খাল বহিয়া কুমীরও আসিয়া তাহার খিড়কীর ঘাটে হানা দিতেছে। বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই, গৃহে শ্রী নাই; অন্নাভাবে তাহার সংসার, ধর্মের সংসার না থাকিয়া এখন পাপের সংসার হইয়া দাঁড়াইতেছে। চারি পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালী হিন্দু যে পথে চলিতেছিল, এবং সম্প্রতি বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ নানা কারণে যে ভাবে বাঙ্গালীর জীবন প্রতিহত হইতেছে, তাহারই অপরিহার্য পরিণতি এখন আমরা দেখিতেছি।

পৃথিবীতে আশা-বাদী ও নৈরাশ্য-বাদী এই দুই প্রকারের মনো-ভাবের লোক আছে। আমি বিশ্বমানব বা সমগ্র মানবসমাজ সম্বন্ধে আশাবাদী, কিন্তু বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সঙ্কীর্ণ মানব-সমাজ সম্বন্ধে নৈরাশ্যভাব পোষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ব্যাপক ভাবে, সুদূর ভবিষ্যৎ কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে, হয় তো বলা যাইতে পারে যে, মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতিই ঘটিবে; উপস্থিত ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া মানুষ শেষে দেবত্বেই গিয়া পঁহুছিবে। কিন্তু এই দেবত্বে গিয়া পঁহুছিবার পূর্বে, বহু প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ জাতির, তথা বহু অর্বাচীন ও নিম্ন-স্তরের জাতির বিলোপ ঘটিবে। হয় তো বা আমাদের হিন্দু ও ভারতীয় জাতিরও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। একটী জাতির বিলোপ-সাধন ২০০।৫০০ বৎসরে হয় আবার ৫০।১০০ বৎসরেও হয়। উপস্থিত হিন্দুসমাজের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতি (বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতি) সমষ্টি-গত ভাবে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছে, এবং রোগকে উপেক্ষা করিয়া এই সমাজ ও জাতি এখন মহোল্লাসে আত্মহত্যার পথে ধাবিত হইতেছে। একমাত্র ভগবান ইহাকে বাঁচাইতে পারেন—উঁহার

বিপরীত বুদ্ধিকে দূরীভূত করিয়া, ব্যাপক ভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে শুভ বুদ্ধির প্রণোদন করিয়া; ইহাকে জীবনের পথে চালিত করিতে পারেন। এক্ষণে আমি আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির ও বিনাশোন্মুখতার নিদর্শনের তালিকা দিতে বসিব না। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে আশা ও আনন্দের কিছু যদি কেহ সত্য সত্যই দেখাইতে পারেন, আমাদের নৈরাশ্যের বোঝা হালকা করিতে সাহায্য করিলেন বলিয়া তাঁহার কথা আমরা মাথা পাতিয়া লইব।

বাঙ্গালীর জীবনে একটা প্রধান এবং লক্ষণীয় দৌর্বল্য বা কলঙ্ক—অন্ধ স্বার্থপরতা। আমাদের সমাজ-গত জীবনে নানা ভাবে ইহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে উচ্চ নৈতিক আদর্শ-সমূহ হইতে আমরা অহরহঃ ভ্রষ্ট হইতেছি—কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ-গত বা সঙ্ঘ-গত জীবনে। এই স্বার্থপরতা আমাদের মধ্যে এরূপ ভাবে আগে কখনও দেখা দেয় নাই। পূর্বে জীবনযাত্রা সরল ছিল, তাহাতে নীতিহীনতা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। এখন আমাদের জীবন আরও অনেক জটিল, আরও অনেক ব্যাপক হইয়াছে; ইহাতে স্বার্থান্ধতা আসিলে, তাহার কুফল আরও গভীর ও ব্যাপকভাবেই ঘটে। যাহা হউক, নৈতিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া নিজের ধৃষ্টতা বাড়াইতে চাহি না। এই স্বার্থপরতা-প্রমুখ আমাদের সমস্ত নৈতিক অবগুণ শেষে একটী প্রধান চরিত্রগত অবগুণে গিয়া ঠেকে—সেটি হইতেছে, ব্যক্তিগত ও সমাজ-গত জীবনে discipline বা দম-গুণের অভাব।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, ভারতবর্ষের চিন্তাশীল লোক-নিয়ন্তৃগণ জীবনে পালন করিবার জন্য তিনটি বড় নীতির অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলাম। এই তিনটী নীতিকে তাঁহারা 'অমৃত-পদ' আখ্যায়

অভিহিত করিয়াছিলেন। এই তিনটি হইতেছে—'দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ'; অর্থাৎ self-discipline বা আত্মদমন, renunciation বা অনাসক্তি, এবং preserving intellectul clarity অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রমত্ততা বা কলুষ হইতে মুক্ত রাখা। এই তিনটি অমৃত-পদ অন্য সমস্ত সদ্‌গুণের ও সদ্‌বৃত্তির আদি ও আধার। দুই হাজারের অধিক বৎসর পূর্বে একজন সুসভ্য গ্রীক, যিনি ভারতের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজেকে 'ভাগবত হেলিওদোর' বলিয়া পরিচিত করেন, তাঁহার নিকট এই 'দম, ত্যাগ, অপ্রমাদে'-এর আদর্শ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, এবং তিনি লেখ-সংস্থাপন দ্বারা তাহার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির ও মনোভাবের এক বিশিষ্ট প্রকাশ এই তিনটি অমৃত-পদের প্রচারের দ্বারাই হইয়াছিল। ব্যক্তি-গত ও সমাজ-গত জীবনে এই তিনটীর মত কার্যকর নীতি আর কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের জীবনের কোনও দিকে আর এই 'দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ' কার্যকর হইতেছে না। অথচ আত্মবিস্মৃত, ভিতরে ও বাহিরে সর্বতোভাবে পর্যুদস্ত, সব দিক্ দিয়া বিপন্ন জাতির পক্ষে, আত্মসমাহিত হওয়া, তিতিক্ষাবৃত্তি পালন করা এবং চিন্তাশক্তিকে নিষ্কলুষ রাখা অপেক্ষা আশু আবশ্যক আর কি হইতে পারে?

যুগে-যুগে যখনই ভারতের ধার্মিক ও আত্মিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে, ভারত বিপন্ন হইয়াছে, তখনই ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ ভারতের মহাপুরুষগণ এই একই উপদেশ নবীন ভাবে ঘোষিত করিয়াছেন। উপনিষদে 'দাম্যত দত্ত, দয়ধ্বম্' রূপে এই বাণীই ঘোষিত। বুদ্ধদেব সর্বপাপ হইতে বিরতি, নিজ চিত্তের উন্নতি ও সকলের কুশলে আত্ম-নিয়োগ—এই রূপে এই বাণী প্রচার করিয়া যান। অপ্রমাদকে তিনিও অমৃত-পদ বলিয়া গিয়াছেন। শঙ্করের জ্ঞানের সাধনা অপ্রমাদযুক্ত

চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই হয়, দম ও ত্যাগ তো ইহার প্রথম সোপান। মধ্যযুগের ভক্তিবাদের মধ্যেও দম ও ত্যাগের দ্বারা আত্মশুদ্ধির, এবং অপ্রমাদের বা সত্যদৃষ্টির দ্বারা চিত্তশুদ্ধির শিক্ষা বিদ্যমান।

ভারতের তাবৎ সম্প্রদায়ের শিক্ষা এই-ই। তবে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ্য বিনয় বা মনঃশিক্ষার মধ্যে এই তিন গুণ অপেক্ষিত। বেদ, পুরাণ ও আগম—এই সকল বিভিন্ন শাস্ত্রকে একতাসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এমন একটী ভাবধারা বিদ্যমান, সে ভাবধারা হইতেছে ব্রাহ্মণ্যের ভাবধারা। বেদসংহিতার কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত যুগে-যুগে নানা ভাবে বিদ্যমান এই ব্রাহ্মণ্যের ধারার মধ্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ নিহিত—এই আদর্শ লইয়াই আমরা জগতের সমক্ষে মস্তক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইতে পারি।

ভূদেব আসিয়াছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুকে আবার নূতন করিয়া এই ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ দেখাইতে, তাহাকে সে সম্বন্ধে সচেতন করিতে। ব্রাহ্মণ্যের আদর্শের একটা বড় দিক্ এই যে, আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহা সংসারকে একেবারে বর্জন বা উপেক্ষা করিতে চাহে না। বুদ্ধদেব-প্রচারিত বৈরাগ্য লইয়া চলিলে, জগৎ-সংসার বা মানব-সমাজ অচল হইয়া উঠে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের ফলে সমস্ত দেশ সংসার-ত্যাগী ভিক্ষু ভিক্ষুণীতে ভরিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ—আশ্রম-চতুষ্টয়; ব্রাহ্মণ্যের উপাস্য—গৃহী উমাপতি শিব, শ্রীপতি বিষ্ণু। গৃহীর আশ্রম ব্রাহ্মণ্যের আদর্শে অবশ্যপালনীয়। পরিবারকে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের ব্যবহারিক প্রচেষ্টা। ব্রাহ্মণ গৃহস্থের আদর্শ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে ভূদেব চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যে বিষয়ে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। আধুনিক কালের ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুর গার্হস্থ্য

জীবনে এই প্রাচীন আদর্শ কি ভাবে কার্যকর হইতে পারে, ভূদেবের জীবন তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্থল।

দুইটী জিনিসের দ্বারা তাঁহার জীবনে এই আদর্শ যে সার্থক-ভাবে পালিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রথম—এই আদর্শ পালন দ্বারা বাড়ীর ভিতরে তিনি সকলের নিকট হইতে অনন্যলব্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আত্মীয় ও পরিজন সকলেই তাঁহার এই আদর্শে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন;—ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই আদর্শ সত্য-রূপে পালিত হইতে বাধা হয় নাই; ইহা একটী উপেক্ষা করিবার মত কথা নহে। ভূদেবের পুত্র-কন্যাগণ ও অন্য স্নেহাস্পদগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন, প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কেবল কর্তব্যবোধে এতটা হয় না; ভূদেবের যে সকল আত্মীয় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপে এ বিষয়টী পরিস্ফুট হয়। ইহা কেবল প্রাচ্যদেশ-সুলভ গতানুগতিক গুরুজনের প্রতি ভক্তি মাত্র নহে। কথায় আছে—'যার সঙ্গে ঘর করি নাই সে বড় ঘরণী, যার হাতে খাই নাই সে বড় রাঁধুনী।' দূর হইতে মানুষকে চেনা যায় না, কাহাকেও স্বরূপে বুঝিতে হইলে তাহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ-ভাবে মেলামেশা করা চাই। আবার এ কথাও আছে—no one is a hero to his valet; এ কথা অবশ্য আদর্শ হইতে hero-র খাটো হওয়ার কারণে যেমন সম্ভব হয়, আবার তেমনি valet-এর hero-কে বুঝিতে পারিবার শক্তির অভাবেও সম্ভব হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যাহারা আমার ভাল-মন্দ সব দিক্‌টা দেখিতে পায়, তাহাদের কাছে যদি আমি বড়ই থাকি, তাহা হইলে আমার মহত্ত্ব কিছু পরিমাণ স্বীকার করিতেই হয়। বাড়ীর বা দলের কর্তার মহত্ত্ব-প্রচার ব্যাপারে একটা dynastic বা domestic—একটা পারিবারিক বা ঘরোয়া

বন্দোবস্ত থাকিতে পারে। এরূপও হইয়া থাকে যে, জীবনে মহাপুরুষের আদর্শ কার্যকর হইল না, আচারে-ব্যবহারে সেই আদর্শের কেবল অবমাননাই হইল—অথচ মহাপুরুষের নামটুকু কেবল exploit করা হইল, তাহা হইতে কেবল পার্থিব বা সামাজিক সুবিধাটুকু গ্রহণ করা হইল। কিন্তু কেবল ঘরোয়া চালাকির দ্বারা এইরূপ দেশব্যাপী ও দীর্ঘকালব্যাপী মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। বাহিরের লোকে আরও কিছু চায়। ভূদেবের নিকট হইতে বাহিরের লোকে তাহা পাইয়াছে। বাহিরের লোকে যাহা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহার আদর্শ-পরিপালনের সার্থকতার দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভূদেব বড় চাকুরী করিতেন, বাংলার শিক্ষাবিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল চাকুরী বজায় রাখেন নাই। তিনি তাঁহার চাকুরীকে দেশসেবার একটী উপায় বলিয়াই ভাবিতেন। এদেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য পাঠশালা ও ইস্কুলগুলিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় ও সেগুলির কার্য পরিবর্ধিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে তিনি বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান করিতেন, গভীর-ভাবে অনুশীলন করিতেন। তাঁহার কতকগুলি রিপোর্ট, আধুনিক-কালের উত্তর-ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যতটা পাবা যায় ততটা প্রচার করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন, আবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, পিতৃপুরুষগণ হইতে লব্ধ অমূল্য রিক্থ, সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাতে অধীত ও সংরক্ষিত হয়, তজ্জন্য আজীবন প্রয়াস করিয়াছিলেন, নিজ উপার্জনের একটী বৃহৎ অংশ তদুপলক্ষে দান করিয়া গিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের হিন্দুদের সংস্কৃতি কেবল সংস্কৃতাশ্রয়ী হিন্দী ভাষার

সহায়তায় বাঁচিতে পারে, তজ্জন্য বহু পূর্বে এবিষয়ে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিহার ও সংযুক্ত-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে শতকরা ৯০-এর উপর অধিবাসী হিন্দু, অথচ তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত কায়থী বা দেশনাগরী অক্ষর আদালতে গ্রাহ্য ছিল না; ভূদেব এই অনুচিত ব্যাপারের সংশোধনের জন্য যত্ন করেন, এবং তাঁহারই চেষ্টার ফলে বিহার-অঞ্চলে 'নাগরী-প্রচার' হয়, আদালতে কায়থী ও দেবনাগরীর আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; ভোজপুরিয়া গ্রাম্য কবি, দেহাতী বুলীতে ভূদেবের এই চেষ্টার সাধুবাদ করিয়া গান বাঁধিয়া গিয়াছেন, সে গান স্যর্ জ্যর্জ গ্রিয়ার্সন সংগ্রহ করিয়া স্বরচিত ভোজপুরিয়া ভাষার ব্যাকরণে ছাপাইয়া দিয়াছেন। দেশে শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য ভূদেব যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রবহমান কার্যস্রোতের মধ্যে পড়িয়া, কাল-ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, সরকারী কাগজ-পত্রের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের কথা আমরা সকলেই জানি, কারণ এই ব্যাপারের মধ্যে লোক-চক্ষে একটা চমক-প্রদতা আছে। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিতে-করিতে শিক্ষা-সংস্কারের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃত ও অন্য বিদ্যা শিক্ষা কতটা সরল, সহজ ও কার্যকর হইয়াছে, তাহার খবর কে রাখিত? শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শ্রমশীল ঐতিহাসিক, পুরাতন নথী-পত্র ঘাঁটিয়া সে সব কথা বাহির করিয়া আমাদের গোচরে না আনিলে, আমরা সে বিষয়ে অজ্ঞই থাকিয়া যাইতাম—সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের আড়ালে শিক্ষা-নেতা বিদ্যাসাগর চিরকালই গুপ্ত থাকিতেন। ভূদেব-সম্বন্ধে এই সব কথার কিছু আভাস তাঁহার উপযুক্ত পুত্র-কর্তৃক রচিত জীবন-চরিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা আবশ্যক।

শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে ও প্রাচীন সংস্করণ-কল্পে ভূদেব যাহা করিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন মানুষের দুঃখমোচনের জন্য তিনি যে দান, যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার কল্যাণব্রত ও তাঁহার আদর্শের উদ্‌যাপন ঘরের বাহিরেও কি ভাবে হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। তাঁহার কর্মজীবনে দান—বিশেষতঃ গোপন দান—একটী লক্ষণীয় আচরণ ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার সাধ্বী পত্নীর সহযোগিতা উল্লেখ করিতে হয়। নিজ বাসস্থানে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, তাহাও উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার উপার্জন কেবল নিজের ও নিজের পরিজনের জন্য ছিল না—পরিবার-বহির্গত আর্ত ও দুঃস্থেরও তাহাতে অধিকার আছে, এ বোধ তাঁহার ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে তিনি পাইয়াছিলেন; এবং ইহার দ্বারাই তাঁহার অর্থোপার্জন করা সার্থক হইয়াছিল, অর্থোপার্জন তাঁহার সম্মুখে সদা-রক্ষিত উচ্চ আদর্শের অনুসারীই ছিল।

ভূদেব যে আদর্শ নিজে পালন করিতেন ও নিজ লেখায় যাহাকে চিরস্থায়ী সাহিত্যিক রূপ দান করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শের কয়েকটী বিশিষ্ট দিক্ বা লক্ষণ আলোচনা করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিব। এই আদর্শ, উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর এই ভীষণ আপৎকালে, কতদূর পালিত হইতে পারে, এবং পালন করিলে তাহা কি ভাবে জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে, তাহা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

ভূদেবের আদর্শের মধ্যে একটী জিনিস সব চেয়ে বেশি করিয়া চোখে ঠেকে—সেটী হইতেছে তাঁহার অন্তর্নিহিত আত্মমর্যাদা-বোধ। এই আত্ম-মর্যাদার জ্ঞান, ব্রাহ্মণ্যের একটী প্রধান বাহ্য প্রকাশ। ইহা সমীক্ষা এবং আত্মদমনের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা আভ্যন্তর সাধনার এবং

শক্তির ও তেজের পরিচায়ক। এইরূপ আত্মমর্যাদা-বোধ মানুষকে মাথা তুলিয়া নিজ মহিমায় দাঁড়াইতে শিক্ষা দেয়, ইহার সমক্ষে inferiority complex বা আত্মলাঘব-ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। যেখানে সত্যকার সাধনা ও কৃতিত্ব, সেইখানেই শক্তি, সেইখানেই সেই শক্তির সত্তায় নির্ভীকতা থাকে। ভূদেব নিজের জাতির সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন; প্রথমতঃ তাঁহার পিতার প্রসাদে, ও পরে অনুশীলন দ্বারা হিন্দুজাতির কৃতিত্ব কোথায়, তাহা তিনি ভাল করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু প্রতীচ্য বিদ্বৎসভায় তিনি সহজেই তুল্য আসনে বসিতেন। এই আত্মমর্যাদার ফলে তিনি একটা urbanity বা মনঃসম্বন্ধীয় নাগরিকতা বা ভব্যতার অধিকারী হইয়াছিলেন—তাঁহার মধ্যে গ্রাম্য সঙ্কোচ বা অভব্যতা ঠাঁই পায় নাই। যেখানে বিদেশীর কৃতিত্ব, সেখানে সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই; আবার যেখানে আমাদের যথার্থ গৌরব বা আমাদের সুবিবেচনার প্রমাণ আছে,—সেখানে বিদেশের একপত্রিগণের মত প্রতিকূলে হইলেও পরম আত্মনির্ভরতার সহিত তিনি স্থির থাকিতেন। 'তেরা দরবার শাহানা, মেরী সূরৎ ফকীরানা'—এই বলিয়া ইউরোপের ঐশ্বর্য ও শক্তির ঔজ্জ্বল্যে আত্মহারা হইয়া, নিজের জাতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকেও বিকাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভূদেবের সমগ্র জীবনে, এবং তাঁহার সমগ্র লেখায়, এই গুণটী ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে শ্লেষ করিয়া বালক ভূদেবকে বলিয়াছিলেন—'পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল—কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা এ কথা স্বীকার করিবেন না।'—সে শ্লেষপূর্ণ উক্তি ভূদেব মাথা পাতিয়া লন নাই—পিতার নিকট হইতে এ বিষয়ে হিন্দুজাতির প্রাচীন মত কি তাহা জানিয়া লইয়া,

যথাকালে শিক্ষকের গোচরে আনিয়া, তাঁহার ত্রুটি স্বীকার করাইয়া তবে স্থির হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার ভূদেবের সহপাঠী মধুসূদনের মত উদার-হৃদয় কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; জাতীয় মর্যাদাবোধ-সম্পন্ন প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে ভূদেবের বাল্য-জীবনের এই ঘটনা আকৃষ্ট করিবে।

হিন্দুজাতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে ভূদেবের যে ধারণা ছিল, হয় তো সে ধারণার সঙ্গে এখন আমাদের সকলের ধারণার মিল হইবে না; হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও ইহার আপেক্ষিক বয়ঃক্রম সম্বন্ধে এবং ইহার সৃজন ও পরিবর্ধনে আর্য ও অনার্যের সাহচর্যের কথা লইয়া আমাদের কেহ-কেহ হয় তো নবীন, এবং ভূদেবের সময়ে অজ্ঞাত, মত পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা হইলেও, একটী প্রাচীন ও সুসভ্য জাতি, যে জাতির সংস্কৃতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া বংশপরাম্পরা-ক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সেই জাতির ঘরের ছেলেরই মত তিনি আধিমানসিক বিষয়ে আচরণ করিতেন। হিন্দু আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধেও তাঁহার আস্থা ও বিশ্বাস প্রগাঢ় ছিল, এখানে তাঁহার পক্ষে আত্মাভিমান-সম্পন্ন হওয়া বিশেষ ভাবে স্বাভাবিক ছিল।

আজকাল আমরা এই আত্মমর্যাদা-বোধ হারাইতে বসিয়াছি। জাতির প্রাচীন প্রতিষ্ঠাকে একেবারে বর্জন করার ফলে, অথবা তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বনের ফলেই বহু স্থলে ত্রুটী ঘটিতেছে। বাহ্য-জীবনে থাকিবার ঘর আমরা যেমন ফিরিঙ্গীদের পরিত্যক্ত শস্তা আসবাবে ভরতী করি, নিজেদের হাস্যাস্পদ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি, মনোজগতে তেমনি ইউরোপের পরিত্যক্ত বুলি এবং ইউরোপের অসমাপ্ত প্রয়াস লইয়া, পরম ও চরম পদার্থ পাইয়াছি ভাবিয়া, অশোভন মাতামাতি করি,—একটু চিত্তস্থৈর্যের ও ধৈর্যের সঙ্গে বস্তুটী বা অবস্থাটী

বুঝিবার চেষ্টা করি না। এবিষয়ে ভূদেবের দৃষ্টান্ত ও তাঁহার শিক্ষাকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আত্মমর্যাদা-বোধের সঙ্গে-সঙ্গে স্বাজাত্য-বোধ এবং স্বজাতি-প্রীতি ভূদেবের চরিত্রের একটী বড় কথা। আজকাল একটু উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ ভাগ্যবান্‌দের মধ্যে দেখা যায় যে, খাঁটী বাঙ্গালী ভাবে, হিন্দু ভাবে জীবন-যাপন করা যেন লজ্জার কথা, ঘরের মধ্যেও তাঁহারা international হইতে চাহেন। যিনি যত বড, তাঁহার চাল-চলনও ততটা তাঁহার জাতি ও সমাজের বিশিষ্ট চাল-চলন হইতে পৃথক্। নিজের জাতির নিকট হইতে ও নিজের সমাজের পারিপার্শ্বিক হইতে পলাইয়া গিয়া যেন ইঁহারা বাঁচেন। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, কলিকাতার ও অন্য কোন-কোনও স্থলের সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী, দেশের বুকের মধ্যে বাস করিয়াও সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিজের দেশের মাটি হইতে আপনাদিগকে deracine বা মূলোৎখাত করিয়া ফেলিয়াছেন ও ফেলিতেছেন। এই যে স্বজাতি ও স্বশ্রেণীর লোক-দিগকে কার্যতঃ বর্জন করা, ইহার মধ্যে কতটা ভাবদৈন্য, কতটা প্রচ্ছন্ন আত্মাবনতি বিদ্যমান, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। আমাকে জনৈক ভিন্ন-প্রদেশীয় উচ্চপদস্থ হিন্দু ভদ্রব্যক্তি, আমাদেরই একজন বাঙ্গালী ভাগ্যবান্ হিন্দু গৃহস্থ-সন্তানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, একবার উক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য-গ্রহণের সম্ভাবনা ঘটায় বাঙ্গালী হিন্দুসন্তানটী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—I hope you are not orthodox because I do not keep any Hindu servants। অবশ্য অনেক superior বা উচ্চশ্রেণীর উদারচেতা ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পারিবারিক জীবনেও জাতি এবং ধর্মভেদের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। আমরা মাটী ছুঁইয়া চলি, আমাদের মধ্যে সে ঔদার্য

আসিবে না। কিন্তু উক্ত বিভিন্ন-প্রদেশীয় ভদ্রব্যক্তিটীর স্বরে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে আমার স্বজাতীয় ভাগ্যবান্ পুরুষদের কাহারও-কাহারও আন্তর্জাতিকতার বহর এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়া আমাকে অধোবদন হইতে হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া তো শিখিই না, ঠেকিয়াও শিখি না; এবং আমরা এমনই সুবিধাবাদী হইয়া পড়িতেছি যে ক্ষণিক সাশ্রয় বা লাভ হইবে বলিয়া নিজেদের বিকাইয়া বা বিলাইয়া দিতেও প্রস্তুত থাকি।

ভূদেবের মত স্বাজাত্য-বোধ না আসিলে, বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ভূদেবের এই শিক্ষাকে বিশ্বাসীর কাছে গুরু-দত্ত উপদেশ বা দীক্ষামন্ত্র যেমন, সেইভাবে জীবনে কার্যকর করিয়া তুলিবার সময় এখন আসিয়াছে।

ভূদেবের আদর্শের দ্বিতীয় কথা—আচারনিষ্ঠতা। হিন্দুর জীবন বাহ্য বা ব্যবহারিক দিকে যে সকল চর্যা ও অনুষ্ঠান এবং বিধি ও নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আছে, ভূদেব সেগুলির উপযোগিতায় পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। দেশের জলবায়ু ও দেশের লোকের প্রকৃতি অনুসারে যে আচার দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে হিতকর, ভূদেব বিশ্বাস করিতেন সেই আচারই শাস্ত্রে লিপি-বদ্ধ হইয়া আছে, এবং দেশের পুঞ্জীভূত, বহু সহস্র বর্ষ-ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ সেই আচার অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রে নিহিত বিধি-নিষেধ পালন করিয়া চলিলে, ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। এখন সুবিধাবাদী আধুনিক জীবনের সঙ্গে আচার-নিষ্ঠতা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না বলিয়াই প্রধানতঃ আমরা আচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। এক প্রকার আচারের পরিবর্তে অলক্ষ্যে

আমরা বহু স্থলে আবার অন্য প্রকারের আচারের নিগড়ে আমাদের বদ্ধ করিয়া থাকি। একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভূদেবের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের অবস্থা যাহা ছিল, এখন তাহা বদলাইয়া পূর্বাপেক্ষা অন্য প্রকারের হইয়া গিয়াছে। ১৮৩৪ সালে যে আচার-নিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল, ১৯৩৪ সালে তাহা পূর্ণ ভাবে পালিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যুগে যুগে সামাজিক বিধি-নিষেধ পরিবর্তিত হয়। আমাদেরও এ বিষয়ে আবশ্যক-মত পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ভূদেব এখন জীবিত থাকিলে, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন। নিত্য-ধর্ম তাঁহার কাছে লৌকিক-ধর্ম অপেক্ষা বড়। আতিথ্যকে আচার-নিষ্ঠতা অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিবার শিক্ষা তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে লাভ করেন। হরিজন-আন্দোলন ভূদেবের সময়ের কথা না হইলেও, তাঁহার পিতা এ বিষয়ে কতটা যে উদার ছিলেন, তাহা ভূদেবের মুসলমান ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বৃদ্ধ পিতার ব্যবহারে বুঝা যায়; ঐ ছাত্রেরা বাড়ীতে আসিলে, তিনি তাহাদের জলপানের জন্য পৃথক্ পিতলের গেলাস ও রেকাবী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশ্য এই ভদ্রতার পিছনে ব্রাহ্মণের যে আচার-নিষ্ঠা ও যে জাত্যভিমান বিদ্যমান ছিল, তাহা আজকালকার দিনে আমাদের পক্ষেও মানিয়া লওয়া কঠিন হয়, এবং তাহাতে সাত্মাভিমান বা অন্য অহিন্দু হয় তো তৃপ্ত হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্রের সীমাকে অস্বীকার করিলে তো চলিবে না।

এখন হিন্দু সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে স্পর্শদোষের আতিশয্য আর থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দ ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। জাতির গোঁড়ামি—বিশেষ ছোঁয়া-

লেপায় এবং খাওয়া দাওয়ায়—ধরিয়া রাখিতে গেলে, হিন্দুয়ানী এবং হিন্দুজাতি টিঁকে না; হয় জাতির গোঁড়ামি অর্থাৎ স্পর্শদোষ যাইবে,—নয় হিন্দু জাতি যাইবে, এবং উহার সহিত স্পর্শদোষেরও সহমরণ ঘটিবে। নানা ব্যাপার দেখিয়া ইহাই আমার মনে হয়। এখন ভূদেব বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার মত কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থার এবং তদনুসারে মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া, লোকাচার বা সমাজ অনুসরণ করিয়া, শাস্ত্রও বদলাইতেছে।

ভূদেবের জীবনে প্রধান শিক্ষা তিনি তাঁহার পারিবারিক-প্রবন্ধে এবং সামাজিক-প্রবন্ধে লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বইটীতে সমাজ-জীবনের ব্যষ্টি-স্বরূপ পরিবারের সুনিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই; দ্বিতীয় বইটী, জাতি ও সমাজের সমষ্টি-গত জীবন সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার ফল। যে ধরণের পরিবারের সঙ্গে তিনি বিশেষ-ভাবে পরিচিত ছিলেন, যাহার কথা তিনি মুখ্যতঃ আলোচনা করিয়াছেন, সেটী হইতেছে বাঙ্গালা দেশের আত্মীয় ও কুটুম্ব-বহুল, চতুর্দিকে প্রসারিত, বাঙ্গালী হিন্দু যৌথ পরিবার। এই পরিবারের গড়নে এখন ভাঙ্গন ধরিয়াছে;—ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে, পিতা মাতা পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী পিতৃস্বসা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদি বহু-পরিজনময় যৌথ পরিবারের পরিবর্তে, স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাময় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইতেছে; ভূদেব কিন্তু এই ভাঙ্গা যৌথ পরিবার, আধুনিক ধরণের শহরের ফ্লাট্-বাসী পরিবারের কথা ধরেন নাই। কিন্তু আমাদের আধুনিক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিস্তর পরিবর্তন আসিয়া গেলেও, ভূদেবের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা

পরিবারের পরিচালন বিষয়ে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারি। গার্হস্থ্য জীবনকে সুখময় করিতে সহায়তা করিবার জন্য এই বইয়ের উপযোগিতা এখনও আছে। লোক-চরিত্রের সহিত, এবং পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের উদ্দেশ্য ও ভাবের সহিত ভূদেব এই বইয়ে গভীর পরিচয়ের নিদর্শন দিয়াছেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী মূল্যবান প্রামাণিক বই; সাহিত্যের সহিত জীবনের বিশেষ সংযোগ আছে বলিয়া, এবং এই বইয়ে সত্য-দর্শনের সঙ্গে জীবনেরই কথা আছে বলিয়া, ইহা যথার্থ-সাহিত্য-পদ বাচ্য।

পারিবারিক জীবনকে ভূদেব অতি পবিত্র বোধ করিতেন। সেই কারণে, এবং মুখ্যতঃ বোধ হয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুঘরের ছেলে বলিয়া, তিনি বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান অনুমোদন করিতে পারেন নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ঘরে এ বিষয়ে তাঁহার আপত্তি না থাকিলেও, তাঁহার মতে আভিজাত্য-সম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুঘরে বিধবা-বিবাহ হওয়া অনুচিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার মতানৈক্য ছিল। এ ক্ষেত্রেও বলিতে হয়, ভূদেব পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে অবস্থিত বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতি এরূপ নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়াছিলেন যে, নিম্নে পৃথিবীর উপরে কি হইতেছে বা হইতে পারে, সেদিকে দেখিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। ভূদেবের সময়ে বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজের একটা গুরুতর সমস্যা-রূপে দেখা দেয় নাই। এখন হিন্দু-সমাজের সমক্ষে নূতন অনেক-গুলি সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। বিষয়-কর্মের ও অর্থাগমের অভাব ঘটিতেছে বলিয়া বহু শিক্ষিত যুবকের বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করার সঙ্কল্প; নির্মম হৃদয়হীনতার সহিত পণ-প্রথার প্রসার; বহু পিতা কর্তৃক বাধ্য হইয়া, কন্যাদের স্বীয় আজীবিকার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের উদ্দেশ্যে, স্কুল ও কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা;

'সহশিক্ষা'-র প্রসার লাভ, অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক-যুবতীর অবাধ মেলা-মেশার ও "বন্ধুত্ব"র সুযোগ, এবং তাহার আনুষঙ্গিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা ; পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বা পুরুষদের সঙ্গে-সঙ্গে, মেয়েদের কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ ; ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে কোনও সমাধান বা সমাধানের ইঙ্গিত ভূদেবের রচনায় মিলিবে না, কারণ তাঁহার যুগে এগুলি বাঙ্গালীর জীবনে প্রকটিত হয় নাই। কিন্তু এই সব বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব (আজ-কালকার অনেকের মত) যে অন্ধ-ভাবে রক্ষণশীল হইত না, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পারিবারিক-প্রবন্ধে ভূদেব যেমন আমাদের সমাজের ও ঘরের কথা বলিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলার ক্ষেত্রে কোনও খুঁটিনাটি বিষয়ের বাদ দেন নাই, সামাজিক-প্রবন্ধে তিনি একটু ব্যাপক-ভাবে বাহিরের কথা শুনাইয়াছেন। এই বইখানিও পড়িয়া এখন আমরা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিতে পারি, সামাজিক ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে ইহা হইতে কতকগুলি প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শন পাইতে পারি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তবে ভূদেবের ঈপ্সিত ভারতীয় nationalism বা জাতীয়তা সম্বন্ধে একটী কথা আমার মনে লাগে, এবং সেই কথাটী বিশেষ করিয়া প্রণিধানের যোগ্য। সংস্কৃতি-বিষয়ে বাঙ্গালী ভূদেব হইতেছেন পূরাপূরি ভারতীয়,—আধুনিক একদল বাঙ্গালী লেখক, সংস্কৃতি-বিষয়ে 'ভারত-বনাম-বাঙ্গালা'র যে বুলি ধরিয়াছেন, ভূদেব সে পথের পথিক ছিলেন না। আমাদের অনেকের কাছে, বিরাট্ বিশাল হিমাদ্রিবৎ ও মহাসাগরবৎ সুবিস্তৃত ভারতীয় সভ্যতা ও মনোভাবের সমক্ষে, তাহারই অংশীভূত এই বাঙ্গালীয়ানার বড়াই অত্যন্ত বিসদৃশ, এবং অজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া লাগে। ভারতের

সনাতন আত্মা আমাদের সাত-আট শত কি হাজার বৎসরের বাঙ্গালীত্বের চেয়ে অনেক বড় জিনিস। আমাদের বাঙ্গালীত্বের পিছনে পট-ভূমিকা স্বরূপে বিগুমান, ইহার আধার ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপে অবস্থিত প্রাচীন মুসলমান-পূর্ব যুগের হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) সংস্কৃতি ও সাধনা। বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক সংস্থানও যেন এই বিষয়েরই ইঙ্গিত করিতেছে—বাঙ্গালা দেশ গঙ্গার দান, যে গঙ্গার উৎপত্তি উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের ক্রোড়-মধ্যে গঙ্গোতরীতে—যে গঙ্গা উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত; প্রয়াগে যে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধার মিলন হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সেই যুক্ত ত্রিবেণী মুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার নদীবহুল সমতট-ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি, উত্তর-ভারতের প্রাকৃত ভাষা—বাঙ্গালায় আসিয়া, এখানকার জলবায়ুর গুণে ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া, পরন্তু তাহার মূল ভারতীয় প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক সংস্কৃতিতে, বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্তিত হইয়াছে। উত্তর-ভারতের সঙ্গে যোগ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে বা ভুলিতে পারি না। অবস্থা-বৈগুণ্যে এখন আমরা বাঙ্গালার বাহিরের, অন্য প্রদেশের লোকের হাতে নিজের ঘরের মধ্যেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি—তাহারা আসিয়া আমাদের বাড়া-ভাতে ভাগ বসাইতেছে। এখন বাহিরের লোকদের শোষণ হইতে আমাদের আত্মরক্ষা করিতে হইবেই; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে অস্বীকার করিয়া কোনও লাভ নাই। উত্তর-ভারত হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া, আমরা খাঁটী বাঙ্গালী, আমরা পৃথক্ "আত্মবিস্মৃত" জাতি, আমাদের সব বিষয়েই ভারতের অন্য প্রদেশের জাতি-সমূহ হইতে একটা বৈশিষ্ট্য ও একটা শ্রেষ্ঠতা আছে',—ইত্যাদি চীৎকার, কতকটা যে ঘর সামলাইয়া লইবার চেষ্টা হইতে উদ্ভূত, কতকটা যে ঘরের কুমীরের ভয়ে জাত, ইহা বুঝিতে

দেরী লাগে না। ভূদেবের সময়ে এ সমস্ত কথা উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে অনার্য-বাদ আসে নাই, হিন্দু-সন্তান মাত্রেই আর্যামির স্বপ্ন রচনা করিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে আর্য-গরিমার চিন্তায় বিভোর ছিল। এবং বাঙ্গালী তখন 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'ও হয় নাই, তখন সামান্য দুই-পাতা ইংরেজী পড়িয়া বাঙ্গালী ইংরেজের তল্পীদার সাজিয়া উত্তর-ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়া 'বৃহত্তর বঙ্গ' (!) সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত ছিল। বিচার করিয়া দেখিলে এই 'বৃহত্তর বঙ্গ' সৃষ্টিতে তাহার কোনও গৌরব নাই। 'অখণ্ড বা অখিল ভারত'—এই বোধ, বঙ্কিম-ভূদেব-হেমচন্দ্র-রঙ্গলাল-রমেশচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখ ভাবুক ও মনীষীদের হাতে, বিগত শতকের চতুর্থ পাদে ধীরে-ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে—ভারত তথা বাঙ্গালার সংস্কৃতির দিক্ হইতে এই বোধ একটী বড় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক বা বাস্তব জীবনে আমাদের স্বার্থকে বাহিরের বা অন্য প্রদেশের চাপের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না—প্রাণ দিয়া বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিব; কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালা যাহার অংশ মাত্র, সেই ভারত—সেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না।

পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে রাষ্ট্র—এই সমস্ত বিষয়ে ভূদেব আমাদের শ্রোতব্য কথা শুনাইয়াছেন। বহুস্থানে ভূদেবের চিন্তা বা উক্তি এখন ভবিষ্যদ্বাণীর মত শুনায়। সামাজিক প্রবন্ধের বহু অংশ শ্রেষ্ঠ বিচার এবং বিবেচনার ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ছোট কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৯২ সালের পূর্বেই তিনি সমগ্র ভারতের একতার অন্যতম সাধন-স্বরূপ হিন্দী ভাষার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তখন খুব অল্পসংখ্যক লোকই এদিকে অবহিত হইয়াছিলেন।

নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, ভূদেবের আদর্শ—অন্তত: ইহার কোন-কোন অংশ—এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা, আমাদের সমাজের পক্ষে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ভূদেবের প্রবন্ধাবলী ও তাঁহার পত্রাদি হইতেও কিছু-কিছু চয়ন করিয়া, তাঁহার চত্বারিংশ শ্রাদ্ধ-বাসরের স্মারক স্বরূপ একটী ভূদেব-বাণীময় পুস্তক আধুনিক কালের তরুণ-তরুণীদের পাঠের জন্য প্রকাশিত করিলে, এবং তাহা পাঠে ইহাদের প্ররোচিত করিলে, ফল ভাল হইতে পারে।

বিবেকানন্দের মত তূর্যধ্বনি করিয়া সুপ্ত হিন্দুসমাজকে ভূদেব জাগ্রৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই,—তাঁহার ছিল বৃদ্ধ জ্ঞান-তাপসের স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠ। বিবেকানন্দের অগ্নিময় বাণী এবং ভূদেবের বাণীর স্থির জ্যোতি—ভারতীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। ভূদেবের বাণী আমাদের বলিতেছে—আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জানো, নিজের প্রতি বিশ্বাস আনো, নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো। ভগবানের আশীর্বাদে ভূদেবের শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের এই বড দুর্দিনে যেন কার্যকর হয়, যেন আমরা এই শিক্ষা পালন করিয়া জাতি-হিসাবে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

বৃহত্তর বঙ্গ

"বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটী আজকাল আমরা খুবই ব্যবহার করিতেছি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের "প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মেলন"-এর যে সকল অধিবেশন হইতেছে, সেগুলিতে "সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান" শাখা ভিন্ন, উপরন্তু একটী "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখাও স্থান পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন, পত্র-পত্রিকাতেও "বৃহত্তর বঙ্গ"কে হালের

বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরব বলিয়া আমরা নানা জল্পনা-কল্পনা, উচ্ছ্বাস-আলোচনা করিতেছি। কথাটা কিন্তু বেশী দিনের নহে। আমার মনে হয়, ১৯২৬ সালে ভারতের বাহিরের দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচারের ইতিহাস আলোচনার উদ্দেশ্যে যখন কলিকাতায় "বৃহত্তর ভারত পরিষৎ" স্থাপিত হয়, তাহার পরে "বৃহত্তর ভারত"—এই সংযুক্ত পদ দুইটীর দেখাদেখি "বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটীও ব্যবহৃত হইতে থাকে। আগে আমরা "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" জানিতাম, "প্রবাসী বাঙ্গালী" জানিতাম। ১৯০০ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে "বৃহত্তর বঙ্গ" শব্দদ্বয় ও তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব দুর্বোধ্য হইত; ১৮৫০ সালের বাঙ্গালীর পক্ষে কথাটী ও তাহার অর্থ উভয়ই অবোধ্য লাগিত। অথচ এই কয়েক বৎসরে এই কথাটী হালের বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গৌরববোধ, আত্মপ্রসাদ ও শক্তিসংগ্রহ (এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মবঞ্চনার) একটা মস্ত বড় সহায়ক হইয়া পড়িতেছে।

জিনিসটা আমাদের তলাইয়া বুঝা দরকার।

"বৃহত্তর বঙ্গ"—এই কথাটীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ এই—ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে, অর্থাৎ অ-বাঙ্গালী যাহারা বাঙ্গালা ভাষা বলে না, এমন লোকেদের মধ্যে, ব্যক্তি-গত বা সমাজ-গত ভাবে আজীবিকা-সংগ্রহের চেষ্টায় বা অন্য উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীরা গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বসবাস কালে যে সকল কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব-বর্ধন করিয়াছে, মুখ্যতঃ সেই কৃতিত্বের বিচার, এবং সেই কৃতিত্ব-জনিত আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তির আবাহন। সঙ্গে-সঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার ও বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতির আলোচনা, ও যথাযথ ইহাদের বিবর্ধন বা প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া, প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বার্থ ও

অস্তিত্ব রক্ষা করা, তথা আধুনিক ভারতের জাতিবৃন্দের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্থানকে গৌরবের ও সম্মানের স্থান করিয়া রাখা।

সন ১৩০৮ সালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন প্রয়াগ হইতে "প্রবাসী" পত্রিকা বাহির করেন, তখন হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী বা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত জনগণ একটু বেশী করিয়া সচেতন হইতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে "প্রবাসী" পত্রিকার মারফৎ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়, "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" শীর্ষক জীবন-চরিতাত্মক প্রবন্ধাবলীতে যে সব কৃতী বঙ্গ-সন্তান বিগত দুই পুরুষ ধরিয়া (এবং কচিৎ তাহার পূর্বেও) বাঙ্গালার বাহিরে পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে গিয়া স্বীয় বিদ্যা- ও চরিত্র-গুণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হন, ধারাবাহিক ভাবে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের নিকটে তাঁহাদের সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সুপরিচিত "বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকের দুইটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে—এই বইয়ের দ্বারা বৃহত্তর বঙ্গের বোধ বাঙ্গালী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা খুবই বাড়িয়া যাওয়ায়, পশ্চিমের দূরতম প্রদেশ মাত্র দুই-এক রাত্রির, কচিৎ তিন-চারি রাত্রির রেল-ভ্রমণের পথে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে প্রবাসী বাঙ্গালী আর সত্য-সত্য প্রবাসী থাকিতেছেন না, দেশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতর যোগ রাখা সম্ভবপর হইতেছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা—প্রাচীন ভারতের নাবিক, বণিক্, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, শিল্পী, ও সাধারণ ব্যক্তি—ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া, ধর্ম ও সভ্যতার সেই সব দেশে এক অভিনব বৃহত্তর ভারতের

পত্তন করিয়াছিলেন। "বৃহত্তর ভারত", ভারতের এক গৌরবময় অবদান। ইহারই অনুকরণে "বৃহত্তর বঙ্গ", এই ভাবময় সমস্ত পদের সৃষ্টি। "বৃহত্তর ভারত"—মুসলমান-পূর্ব ভারতের কৃতিত্বের পরিচায়ক; ব্যাপক-ভাবে, আধুনিক ভারতের প্রসারের কথাও ইহার মধ্যে নিহিত। "বৃহত্তর বঙ্গ"—মুখ্যতঃ উনবিংশ শতকে ভারতের অন্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা।

এখন, এই কয় বৎসর ধরিয়া "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া আমরা একটু বেশী সাত্মাভিমান হইয়া পড়িয়াছি। ইহার দুইটী কারণ আছে। এই কারণ দুইটী প্রবাসী বাঙ্গালী ও ঘরবাসী বাঙ্গালী উভয়েরই মধ্যে পরিদৃশ্যমান।

প্রথমতঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী যেমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর অবস্থা তেমনই (কোথাও কম কোথাও বা বেশী) খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে বঙ্গের বাহিরে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীর যে সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। অনেক ক্ষেত্রে আবার বাঙ্গালীর সম্মানপূর্ণ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালী আর ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র নহে; ইংরেজের আশ্রয়ে উন্নতি-প্রাপ্ত বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালার বাহিরের বহু স্থানের লোকদের মনে যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষ্যা ছিল, তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ফলে, রাম এবং রাবণ উভয়েরই হাতে তাহার লাঞ্ছনা। এ ক্ষেত্রে উচ্চ পদের প্রতিষ্ঠা এবং সম্ভবতঃ অর্থের প্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত প্রবাসী বাঙ্গালীকে নৈতিক প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অন্ন-সংস্থানের জন্য, অর্থোপার্জনের জন্য, বাঙ্গালার বাহিরে গিয়াছিল, সত্য; কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদের কারণ যে, যে-যে স্থানে চিরতরে সে বাসা পাতিয়াছে,

সেই-সেই স্থানে শিক্ষা ও মানসিক সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য সে অনেক কিছু করিয়াছে। ইহা তাহার জাতির পক্ষে গৌরবেরই কথা। এই ইতিবৃত্তের আলোচনা ও অনুশীলন তাহাকে যথেষ্ট শক্তি দিতে পারে। এই জন্য বৃহত্তর বঙ্গের চর্চা।

দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যে আমাদের ভিতরে একটা পরাজয় ও পরাভবের হাওয়া বহিতেছে। সকলেরই মনে এই ভাবটী অল্প-বিস্তর জাগরিত হইতেছে যে—আমাদের অবস্থা বনের হরিণের মত—"হরিণ জগতবৈরী আপনার মাসে।" বাঙ্গালাকে সকলে মিলিয়া লুঠিতেছে, আমরা দেখিয়াও তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছি না। অন্য বিষয়েও আমরা হটিয়া পড়িতেছি। আমাদের এখন অর্থ নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সব রকমের আশ্রয় আবশ্যক হইয়াছে। "বৃহত্তর বঙ্গ" আমাদের একটী বড় আধ্যাত্মিক আশ্রয়। দৈব-দুর্বিপাকে পড়িয়া যাওয়ায়, এখন আমাদের কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। হাতী পাঁকে পড়িলে, বেঙ্গেও তাহাকে লাথি মারিয়া যায়। আমরা অতীতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছি; যখন হইতে ভারতে ভারতীয় এবং প্রাদেশিক জাতি-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তখন হইতে বাঙ্গালী ভারতের অন্য জাতিদের পশ্চাতে কখনও থাকে নাই। "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"—বঙ্গ-মাতাকে আমরা আত্মবিশ্বাসপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে একথা বলিতে পারি। "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালীর অধুনাতন কৃতিত্বের একটী লক্ষণীয় নিদর্শন, ইহার চর্চায় আত্মবিশ্বাস আসিবে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুঝিবার শক্তি আমরা পাইব,—সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি হিসাবে এই শক্তি পাইব।

বাহিরে ও ভিতরে, অন্য প্রদেশে ও বঙ্গদেশে, "বৃহত্তর বঙ্গ"-বাদ আমাদের কতটা শক্তি দিতে পারে, আমাদের বাঙ্গালী জীবনে কি

ভাবে ইহাকে সার্থক করিতে পারা যায়—তাহা আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু এর আলোচনা ঐতিহাসিক বিচার দিয়া আরম্ভ না করিলে বিশেষ কিছু ফল হইবে না।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করিতে গেলে, তিনটী কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সে তিনটী কথা এই—

[১] বাঙ্গালা-দেশ ভারতেরই অংশ।

[২] বাঙ্গালী জাতি ভারতীয় জাতি-মণ্ডলীরই অন্তর্ভুক্ত, ভারত-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা তাহাব নাই।

[৩] বাঙ্গালার সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অংশ—ভাবত-বিরোধী পৃথক্ বাঙ্গালী সংস্কৃতি নাই।

এইরূপে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ-সূত্রে সংযুক্ত হইলেও, বাংলা-দেশের সংস্কৃতিতে দুই-একটী লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যকে আশ্রয় করিয়া, সংস্কৃতি-বিষয়ে, "বাঙ্গালা-বনাম-ভারত" এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

সংস্কৃতি-বিষয়ে এক হইলেও, অর্থ-নৈতিক ও অন্য বিষয়ে পার্থক্য বা বিরোধ আসিতে পারে। যেমন ইংলাণ্ডের ইংরেজ ও আমেরিকায় উপনিবিষ্ট ইংরেজদের মধ্যে ঘটিয়াছিল; সেরূপ বিরোধ আসিলে, সংস্কৃতির ঐক্য কিছুই করিতে পারে না। তখন আত্মরক্ষা করিবার জন্য বা নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, প্রত্যেক সম্প্রদায় বা সমাজকে সচেষ্ট হইতে হয়। নিজ অস্তিত্ব বা নিজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বাধা প্রদান করা তখন কর্তব্য হইয়াই দাঁড়ায়।

বাঙ্গালী জাতির পূর্ব কথায় "বৃহত্তর বঙ্গ" এই আদর্শ কত প্রাচীন? বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি অজ্ঞাত। তবে এটা ঠিক যে, মগধ হইতে আর্যভাষা ও ভারতের আর্যানার্য-মিশ্র গাঙ্গ সভ্যতা, ভারত-বিজয়ী

সভ্যতা-রূপে বাঙ্গালা-দেশে আসিবার পূর্বে, এদেশে অস্ট্রিক (কোল ও মোন-খ্মের) জাতীয় এবং দ্রাবিড় জাতীয় অনার্য জাতি বাস করিত। ইহাদের নিজস্ব পৃথক-পৃথক সংস্কৃতি ছিল; এবং ইহা অসম্ভব নহে যে, কোথাও-কোথাও ইহাদের মধ্যে সংস্কৃতি-গত এবং শোণিত-গত মিশ্রণও হইয়াছিল। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির লোকেরা কিন্তু নিজ জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইতে পারে নাই। তাহা হইলে, আজ পর্যন্ত ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি জীবিত থাকিত—অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালা দেশ পূরাপূরি আর্যভাষী হইয়া পড়িত না। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপজাতির লোক—ইহাদের মধ্যে কোনও সংহতি-শক্তির উদ্ভব হয় নাই; দুইটী পৃথক্ জগৎ—অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়—দুইয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় কখনও হইতে পারে নাই; ঐক্য-বিধায়ক এমন কিছু বাঙ্গালা দেশে গড়িয়া উঠে নাই, যদ্দ্বারা উত্তর-ভারতের আর্য ভাষা ও উত্তর-ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা প্রতিহত হইতে পারিত। খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র দিকে মৌর্য-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। অনুমান হয়, ২৫০ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে বঙ্গদেশ মৌর্যরাজগণের আমলে কোনও সময়ে বিজিত হয়। মৌর্য যুগে পূর্ব-বঙ্গে "সংবঙ্গ" নামে সঙ্ঘ-বদ্ধ বঙ্গীয় গণ-সঙ্ঘের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গবাসিগণের প্রাদেশিক গৌরব বা স্বাতন্ত্র্য-বোধের কোনও পরিচয় আমরা পাই না।

মৌর্য যুগের পরে সুঙ্গ ও কুষাণ যুগ আসিল, গুপ্ত ও পাল যুগ আসিল। পাল যুগের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে সেন রাজাদের শাসনকাল আসিল। তারপরে ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতেই বিজাতীয় ও বিধর্মী তুর্কীদের দ্বারা বঙ্গদেশ বিজিত হইল। তুর্কী বিজয়ের বহু পূর্বেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা আর্য-ভাষী হইয়া গিয়াছে, এবং উত্তর-ভারতের সভ্যতার অংশ গ্রহণ করিয়া, আর্যাবর্তের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। প্রায় সহস্র

বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের আর্যীকরণ চলিতেছিল ; জাতির সেই যুগান্তরের সময়ে বঙ্গবাসিগণের পক্ষে সাত্মাভিমান হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

আমাদের আজকালকার প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার মূল হইতেছে সমভাষিত্ব। খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে এই সমভাষিত্ব বঙ্গদেশে ছিল বলিয়া মনে হয় না, তখন দেশের লোকে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড-গোষ্ঠীর নানা ভাষা বলিত, এবং অনার্য ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্য ভাষার বাঁধন মানিয়া লইয়া তখন এদেশের লোকেরা সবে-মাত্র একতার পথে পদার্পণ করিয়াছে। গুপ্ত এবং প্রথম পাল যুগে, বাঙ্গালার সহিত বিহার ও কাশী অঞ্চলের ভাষাগত সাম্য ছিল বলিয়া মনে হয় ; তখন একই প্রাকৃত বা অপভ্রংশ (খুব খুঁটী-নাটী প্রাদেশিক ভেদ হয় তো ছিল, কিন্তু তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে) সারা পূর্ব-ভারতে আর্যভাষা-রূপে সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল পাল-বংশীয় রাজাদের রাজত্বের শেষ-ভাগে—খ্রীষ্টীয় দশম শতকের দিকে। তখন বঙ্গদেশবাসীর —গৌড়-বঙ্গ জনের—"বাঙ্গালী প্রাদেশিকতা" জন্মলাভ করে নাই ; বাঙ্গালারই মত, ভারতের অন্যত্র কোথাও এরূপ ভাষাশ্রয়ী প্রাদেশিকতা তখন উদ্ভূত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালী তাহার ঘরোয়া ভাষাকে "প্রাকৃত" বলিত, ঘরোয়া ভাষায় সে অল্প-স্বল্প লিখিত ; এবং তাহা ছাড়া পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষাতেই সে বেশি লিখিত ; এই ভাষা যেন ছিল সে কালের হিন্দী ; এবং এতদ্ভিন্ন, উচ্চকোটির সাহিত্য-রচনার জন্য নিখিল ভারতের সর্ব-প্রধান ভাষা সংস্কৃত তো ছিলই।

তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেদের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই, একটী প্রান্ত-নিবদ্ধ বিশেষভাবে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় গৌরব অনুভব না করিয়া, বঙ্গদেশের রাজা, পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক, কবি, শিল্পী, এক

নিখিল-ভারতীয় সভ্যতার পুষ্টিসাধনে অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতটুকু উপায়ন ভারত-মাতার চরণ-তলে সেদিনের গৌড়বঙ্গ-বাসী আনয়ন করিয়াছে, তাহা সে প্রাদেশিক আত্মসত্তা, অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবাসীর সত্তা বা চেতনা উপলব্ধি না করিয়াই করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে, গৌড়-বঙ্গ-মগধ-পতি মহারাজ ধর্মপালের আমলে একবার বঙ্গবাসী উত্তর ভারতের কনৌজের রাজা চক্রায়ুধকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত জয়যাত্রা করিয়াছিল। রাজনৈতিক প্রভাব ও দিগ্বিজয় আদি ব্যাপারে বঙ্গবাসিগণের কৃতিত্ব বিশেষ কিছু ছিল না; মাটি আঁচড়াইলেই যে দেশে ধান মিলিত, সে দেশের লোকেদের বাহিরে যাইবার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃতির বিষয়ে প্রাচীন বঙ্গবাসীরা ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে লক্ষণীয় দান যোগাইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের শেষে যুগের ইতিহাসে বাঙ্গালার স্থান অতি উচ্চে। বৃহত্তর ভারতের পত্তনে বাঙ্গালার সহায়তাও যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশ ও সুবর্ণ-দ্বীপ বা সুমাত্রা এবং যবদ্বীপের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগ ছিল। বাঙ্গালার তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দর, ভারতের সভ্যতার বাহিরে প্রসারের জন্য এক প্রধান পথ ছিল। ভারতে প্রাচীন শিল্পের ইতিহাসে গৌড়-মগধ রীতির ভাস্কর্য একটী প্রধান বস্তু—এই রীতির বিকাশে বাঙ্গালার বরেন্দ্র-ভূমির ধীমান্ ও বীতপাল নামক ভাস্করদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও বঙ্গদেশের দান অল্প নহে। "গৌড়ী রীতি" নামক সংস্কৃত কাব্য-রচনার রীতি বাঙ্গালা দেশেই উদ্ভূত হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ভারতীয় সাহিত্য-গগনে এক উজ্জ্বল

জ্যোতিষ। ব্যাকরণ, শব্দকোষ, টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থেও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণও পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

মোটের উপর, বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ ভারতের সাধারণ সংস্কৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য যথোপযুক্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অংশগ্রহণ-কার্য যখন ঘটিয়াছিল, তখন তাহাদের বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া বিশেষ গৌরব-বোধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না,—তখন বাঙ্গালা ভাষা সূতিকাগারে, এবং বাঙ্গালী জাতির বা অন্য কোনও প্রাদেশিক জাতির মধ্যে এই প্রকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনা আসে নাই। চন্দ্রগোমী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ভট্ট ভবদেব, জয়দেব, বন্দিঘাটীয় সর্বানন্দ প্রভৃতি—ইঁহারা প্রাচীন ভারতের, ইঁহাদের লইয়া সমস্ত ভারত গৌরব করেন—বাঙ্গালী বলিয়া বিশিষ্ট বোধ বা চেতনা ইঁহাদের সময়ে ছিল।

মুসলমান যুগে বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী তখনও পূর্ণভাবে সাত্মাভিমান হয নাই। তুর্কী-বিজয় প্রথমটা বাঙ্গালীব জীবনের অঞ্চল-দেশ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল; ইহা তাহার জীবনকে পূরা-পূরি পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যে একটা উন্মুখ আন্তর্ভারতিকতা জাগিয়া উঠিতেছিল—হিন্দু আমলে স্বাধীন-ভাবে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া তাহা বাঙ্গালীর প্রাদেশিক জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছিল; কিন্তু মুসলমান রাজশক্তি আসিয়া অন্ততঃ কিছু কালের জন্য তাহা ব্যাহত করিয়া দিল। আসন্ন আপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্গালী কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিল, বাধ্য হইয়া সে তাহার গ্রাম্য জীবনের মধ্যেই অঙ্গ-সংহরণ করিয়া লইল। খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের পর হইতে, ১৮৫০ সালের দিকে ইংরেজের সঙ্গে মিলিয়া ভারতের চারিদিকে ছড়িয়া পড়া পর্যন্ত, অর্থাৎ

ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, সাড়ে-সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর যে জীবন ছিল, তাহা মোটের উপর গ্রাম্য জীবন ছিল। যখন রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ, উড়িয়া, তেলুগু, কানাড়ী, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, এই সব জাতি মারামারি কাটাকাটি করিয়া বা মিলন করিয়া ভারতের মধ্যযুগের বা মুসলমান-যুগের ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে নিযুক্ত, তখন, কবির ভাষায়—

সেদিন এ বঙ্গদেশে উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ,
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ !
শান্ত-মুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্মল
শ্যামল উত্তরী,
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লী-সন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি' ॥

মুসলমান যুগে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে নিজ সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার প্রয়াসের ফলে, বাঙ্গালীর সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিল। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে একটা গেঁয়ো ভাব কায়েমী হইয়া গেল। হিন্দু যুগে বাহিরকে লইয়া তাহার যেটুকু কারবার ছিল—ভারতের অন্য প্রদেশকে লইয়া, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের দেশকে লইয়া ছিল,—সেটুকু আর বজায় রহিল না। বাঙ্গালী নিজ সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য সমাজ ছাড়িয়া কচিৎ বাহিরে যাইত—সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য মিথিলা ও কাশী, এবং তীর্থ-যাত্রার জন্য পুরী, গয়া, কাশী, পরে বৃন্দাবন, কচিৎ কাঞ্চী, রামেশ্বর, দ্বারকা—ইহাই তাহার দৌড় ছিল। এতদ্ভিন্ন, কখন-সখন (বিশেষতঃ মোগল-বিজয়ের পরে) কোনও-কোনও বাঙ্গালী

জমিদার, দিল্লী-আগ্রা পর্যন্ত যাইতেন,—বাদশাহের দরবারে সেলাম দিবার জন্য, জমীদারীর সনদ আনিবার জন্য। বাঙ্গালী মুসলমান এবং সম্ভবতঃ দুই চারিজন বাঙ্গালী হিন্দুও বহির্বাণিজ্যের জন্য ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত জাহাজে করিয়া এদিকে বর্মা, মালয়দেশ ও দ্বীপময় ভারত, ওদিকে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল, গোয়া, গুজরাট, এবং আরবদেশ পর্যন্ত যাইত। কিন্তু এই সাগর-যাত্রাটুকুও ফিরিঙ্গী "হর্মাদ" বা পোর্তুগীস বোম্বেটিয়াদের উৎপাতে বন্ধ হইয়া গেল, বাঙ্গালী পুরাপুরি ঘরবাসী হইয়া দাঁড়াইল, তাহার জীবনে সাগরের ছাপ আর পড়িল না। কালাপানি পার হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এবং তখন পণ্ডিতেরা এই কলিযুগে সাগর-যাত্রা নিষিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর একটা গৌরবের পথ এই ভাবে অবস্থা-গতিকে রুদ্ধ হইয়া গেল; মুসলমান রাজশক্তি-ও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিল, কোনও সাহায্য করিতে পারিল না। মোগল-পূর্ব যুগে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভারতীর মত এক-আধজন বাঙ্গালী, বৌদ্ধ হইয়া সিংহলে গিয়া বাঙ্গালার সঙ্গে বাহিরের যোগের পুনরানয়নের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তখন গেঁয়ো ঘরমুখা বাঙ্গালীর কাছে তাহার কুঁড়ে-ঘরের প্রদীপটীই প্রিয় হইয়া গিয়াছিল, সে বাহিরের আলোকে আলেয়া ভাবিয়া তাহার পিছনে ঘুরিতে ভয় পাইল।

"বৃহত্তর বঙ্গ" বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, তদনুরূপ বাঙ্গালীর প্রসার, মোগল-পূর্ব যুগে একমাত্র চৈতন্যদেবের প্রভাবে নূতন করিয়া ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখানেও আমাদের সময়ের মত সজ্ঞান গৌড়িয়াপনা বা বাঙ্গালীয়ানা একেবারেই ছিল না। চৈতন্যদেব আসিয়া বাঙ্গালীকে আর "ঘ'রো" ও "কুণো" থাকিতে দিলেন না; তিনি যে নাম-প্রচারের আহ্বান শুনাইলেন, তাহাতে সে আর নিজ কুটীর বা গ্রামে নিবদ্ধ

থাকিতে পারিল না, তাহাকে বাহিরে আসিতে হইল; রাজনৈতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাকে আর একবার বড় হইতে হইল, ভারতীয় হইতে হইল। চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বাঙ্গালা দেশের নহেন—তিনি বাঙ্গালীত্বের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া কেবল বাঙ্গালীয়ানার বড়াই করা অশোভন ও অনুচিত হইবে, এবং সেরূপ করিলে তদ্দ্বারা চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রের অমর্যাদা করা হইবে। পুরীতে জনৈক উড়িয়া পণ্ডিতের কাছে শুনিয়াছিলাম—চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গভীর ভক্তির সহিত তিনি বলিতেছিলেন—"মহাপ্রভু লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কোনও বিশেষ জাতির নন; তাঁহার বাল্য-জীবন ও প্রথম-যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল বাঙ্গালীদের মধ্যে, দক্ষিণীদের মধ্যে ও হিন্দু-স্থানীদের মধ্যে মধ্য-জীবনের কিয়দংশ তিনি অতিবাহিত করেন, এবং তাঁহার শেষ জীবন তিনি যাপন করেন উড়িয়াদের মধ্যে।" চৈতন্য-দেবের শিক্ষায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল; বাঙ্গালী পুরীতে গেল, সুদূর বৃন্দাবনের তীর্থগুলির উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। হিন্দু যুগের পরে, আবার বঙ্গের বাহিরে, গৌড়-বঙ্গের পণ্ডিতের, ভক্তের ও কর্মীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে, বাঙ্গালী ভাবের—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের—প্রচার, বাহিরের প্রদেশে কিছু-কিছু হইল বটে, কিন্তু তখনও এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর সজ্ঞান ও সাত্মাভিমান বাঙ্গালীয়ানা দেখা দিল না।

মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মানসিংহ আসিয়া পূর্ব-বাঙ্গালার দেবমূর্তিকে আম্বেরে লইয়া

গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত গেল। বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব তদ্রূপ জয়পুরে হিন্দু রাজার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজপুতানার কতকগুলি রাজ্যে, মথুরা বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালী গোস্বামীদের অধিষ্ঠান হইল। বাঙ্গালী জ্যোতিষী, পণ্ডিত বিদ্যাধর, জয়পুর-নগর স্থাপনের সময়ে, সবাই রাজা জয়সিংহের সহায়ক হইলেন। ষোড়শ শতক হইতে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামিগণের অবস্থানের ফলে, বৃন্দাবন বাঙ্গালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটী প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই সব কৃতিত্বের জন্য বাঙ্গালী মর্যাদার বড়াই কেহ করেন নাই—ভারতের আর পাঁচটী জাতির মধ্যে অন্যতম জাতি-হিসাবে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ এই কার্য করিয়াছিলেন।

মোগল-যুগে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালার যোগ-সূত্র আরও সুদৃঢ় হইল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ফারসীর চর্চা বাড়িল। উত্তর-ভারতের রাজ-দরবারে বাঙ্গালার মলমলের চাহিদা বেশী করিয়া হইতে লাগিল। বাঙ্গালার বাঁশের কুঁড়ের চাল-রচনার ধাঁচা, রাজপুত-মোগল বাস্তুশিল্পে pavilion বা বিমান-গৃহ নির্মাণে গৃহীত হইল, ইহার ফলে রাজপুত-মোগল বাস্তুশিল্পে "রেওটী" নামক বাঁকা-ছাত বিমানের উদ্ভব হইল।

মুসলমান যুগে চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়া বাঙ্গালাদেশ হইতে আর কোনও লক্ষণীয় আন্তর্ভারতীয় আন্দোলন উদ্ভূত হয় নাই। ধর্ম-সম্বন্ধীয় আন্দোলন বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীয়ানার কোনও স্থান ছিল না। সজ্ঞান "বৃহত্তর বঙ্গ" তখন হয় নাই, যদিও প্রশংসনীয় ভাবে বঙ্গভাষীর প্রভাব বঙ্গের বাহিরে কোনও কোন দেশে গিয়া পহুঁছিতেছিল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতে বাঙ্গালাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর প্রাদুর্ভাব ঘটিতে থাকে। পারস্য-রাজের আর্মানী-জাতীয় প্রজারা ষোড়শ শতক হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত, বাঙ্গালা দেশেও তাহাদের গতায়াত ছিল। ১৬৫০ সালের পূর্বেই আর্মানীরা কলিকাতায় একটী ব্যবসায়-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল; ইহাদের দ্বারা তৈয়ারী ক্ষেত্রে, ১৬৯১ সালে ইংরেজ যোব চার্নক ইংরেজদের একটা আড্ডা স্থাপিত করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে দেশ-মধ্যে ইংরেজদের প্রভাব ও প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে দুর্বল সিরাজুদ্দৌলার রাজ্যকালে, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। অজ্ঞান, স্বার্থান্ধ, কুচক্রী, মনুষ্যত্ব-বিহীন জনকয়েক বাঙ্গালী ও বঙ্গ-প্রবাসী জমীদার, সমাজ-নেতা, সেনানী ও ধনী ব্যক্তি মিলিয়া, স্বদেশকে ইংরেজের হাতে তুলিয়া দিল।

অষ্টাদশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে বাঙ্গালীর যে অধোগতি হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই! ইংরেজ বাঙ্গালাদেশে রাজা হইয়া বসিল, এবং বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষময় ইংরেজের রাজ্যের প্রসার ঘটাইল। বাঙ্গালারই পয়সায়, এবং কেবল পয়সার জন্য যাহারা কাঁচা মাথা দিতে প্রস্তুত, এরূপ তেলেঙ্গা ও ভোজপুরিয়া সিপাহীর সাহায্যে, ইংরেজ ধীরে-ধীরে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া ফেলিল। ইংরেজ শাসনের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, ইংরেজের তল্পীদার-হিসাবে বাঙ্গালীরও বিস্তার ঘটিল। যেখানে-যেখানে ইংরেজের ছাউনী, ইংরেজের তহশীল, ইংরেজের পুলিস, ইংরেজের দপ্তর, ইংরেজের আদালত, ইংরেজের ইস্কুল, ইংরেজের দোকান ও ইংরেজের ডাকঘর বসিল, যেখানে-সেখানে ইংরেজী-জানা কেরানী, রাজকর্মচারী, শিক্ষক, উকীল দরকার হইল, এবং বাঙ্গালী অল্প দু'পাতা বা বেশী করিয়া ইংরেজী পড়িয়া, সেখানকার ইংরেজী-নবীস লোকের অভাব দূর করিল। হাঁস-

পাতাল হইল, ইংরেজ ডাক্তারের নীচে বাঙ্গালী ডাক্তার গিয়া হাজির হইল। কেবল বাঙ্গালী মজুরের যাইবার দরকার হইল না—উত্তর-ভারতে দৈহিক শ্রমের দ্বারা যাহারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে এমন অশিক্ষিত লোকের অভাব ছিল না। আর বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কেহ গেল না, কারণ ইংরেজের সাহচর্যে আসিয়া ব্যবসায়-কার্যে বাঙ্গালীর উৎসাহ ও প্রবৃত্তি অষ্টাদশ শতকের মধ্য-ভাগ হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। ওদিকে উত্তর-ভারত হইতে দলে-দলে মজুর, চাকর, দরোয়ান, বণিক্ আসিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে কায়েম হইয়া বসিল, পরে বাঙ্গালা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। বিহারী আসিল, হিন্দুস্থানী আসিল, উড়িয়া আসিল; পরে মারওয়াড়ী ও পাঞ্জাবী আসিল—এখন ভাটিয়া ও গুজরাটী আসিতেছে, নেপালী আসিতেছে, তেলুগু আসিতেছে, অন্য মাদ্রাজীও আসিতেছে।

এইরূপে বাঙ্গালার বাহিরে ইংরেজের আমলে ও ইংরেজের আশ্রয়ে নবীন যুগের এক "বৃহত্তর বঙ্গ" যেমন প্রতিষ্ঠিত হইল,—তেমন—সে দিকে আমরা কোনও দৃষ্টি দেই নাই—সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এক-একটী "বৃহত্তর বিহার," "বৃহত্তর হিন্দুস্থান," "বৃহত্তর মারওয়াড়," "বৃহত্তর উড়িষ্যা" এবং হালে "বৃহত্তর পাঞ্জাব," "বৃহত্তর গুজরাট," "বৃহত্তর অন্ধ্র," "বৃহত্তর তামিল্-নাড়ু," "বৃহত্তর কেরল"-ও স্থাপিত হইতে লাগিল। "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার বুকের ভিতরে এই সকল "বৃহত্তর অন্য-প্রদেশ" বেশ বাড়-বাড়ন্ত অবস্থায়, বেশ জাঁকাইয়া বিদ্যমান; আমরা স্বেচ্ছায় ইহাদের নিগড় পরিয়া রহিয়াছি, এবং ইচ্ছা করিলেও নিজেদের মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

ইংরেজ-আমলে এই যে "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা খুব

সচেতন, খুব সাত্মাভিমান বটে,—কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর গর্ব করিবার বড় কিছুই নাই ; একদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, নবীন যুগের এই "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালী জাতির পক্ষে চরম অগৌরবের। ভারতবর্ষের রাজধানী হইতে সুদূর কোণে অবস্থিত একটী প্রদেশের অধিবাসী, একটী গেঁয়ো জাতি,—মধ্য-যুগের ভারতের ইতিহাসে যাহার কোনও স্থান ছিল না, রাজপুত, মারহাট্টা, কানাড়ী, তেলুগুর মত উত্তর ভারতের হিন্দু আর মুসলমানের মত, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস গড়িতে যে কোনও লক্ষণীয় সহায়তা হয় নাই, যাহার একমাত্র গর্বের বস্তু হইতেছে কিছু পরিমাণে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা এবং মধ্য-যুগের আন্তর্ভারতিক ভাব-জগতে চৈতন্যের ব্যক্তিত্বকে দান করা,—সেই অনাদৃত গেঁয়ো জাতি, তাহার নেতাদের অশ্রুত-পূর্ব নীচতা ও মূর্খতার বশে, মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে স্বদেশকে বিকাইয়া দিল ; এবং পরে যখন তাহার দেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সেই অর্থ দিয়া বাহির হইতে সিপাহীদের কিনিয়া, এই বিদেশীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয় করিতে লাগিল, বাঙ্গালীরা অম্লান-বদনে—অম্লান-বদনে নহে, মহোল্লাসে—বিদেশীর পিছনে-পিছনে চলিল। গরীবের হঠাৎ বড়-মানুষী ঘটিল, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল। সাহেবদের সঙ্গে-সঙ্গে, বড়-সাহেবের নীচে বাঙ্গালী ছোট-সাহেব হইয়া উঠিল। উড়িষ্যা-প্রদেশের জনৈক বিখ্যাত জন-নেতার ভাষায়—ruling race-এর সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালীর একটী intermediate ruling race হইয়া দাঁড়াইল।

এক ময়ূর-পুচ্ছে দেহ আবৃত করিয়া বাঙ্গালীর মন অহমিকায়—"হাম-বড়া" ভাবে পূর্ণ হইল ; ইংরেজ-কর্তৃক নূতন বিজিত প্রদেশে তাহার সর্দারী করিতে যাওয়ার মধ্যে যে কতখানি দৈন্য ছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না ;—স্থানীয় লোকেরাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না, তবে ইহাতে

তাহাদের মনের অন্তস্তলে অজ্ঞাত বা প্রচ্ছন্ন-ভাবে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে একটুখানি জুগুপ্সা, বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব না আসিয়া গেল, তাহা নহে। ইংরেজের সাহচর্যের বলে, নূতন-লব্ধ ইংরেজী শিক্ষার দম্ভ ও মোহে, সে ভারতের সুপ্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলিকে বহুস্থলে হেয় ভাবিতে লাগিল। সূর্যের তাপ লোকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু বালির তাপ কেহ সহিতে চাহে না। বঙ্গের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীদের যে স্থানীয় লোকে আর তিষ্ঠিতে দিতেছে না, তাহার অন্তর্নিহিত অন্যতম কারণ বোধ হয় এই :—বিশেষতঃ এখন, যখন সকলেই বুঝিতেছে যে, সরকার-বাহাদুর আর বাঙ্গালীর প্রতি মোটেই প্রীত নহেন। পূর্বেই বলিয়াছি, হাতী পাঁকে পড়িলে বেঙেও আসিয়া লাথি মারিয়া যায়—এ প্রবাদ অতি সত্য অভিজ্ঞতার ফল।

গভীর-ভাবে তলাইয়া দেখিলে, এই "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া হৈ-চৈ করা খুব শোভন ব্যাপার হইবে না। বাঙ্গালীদের "বৃহত্তর-বঙ্গ"-র দেখাদেখি মহারাষ্ট্রীয়েরা "বৃহন্মহারাষ্ট্র" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—"বৃহন্মহারাষ্ট্র" লইয়া সভা-সমিতিও হইয়া গিয়াছে। সকলেই বৃহৎ, সকলেই মহান্। কিন্তু "বৃহন্মহারাষ্ট্র" যে-ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল, সে-ভাবে "বৃহত্তর-বঙ্গ" প্রসার লাভ করে নাই। আবার প্রাচীন কালে (অর্থাৎ মুসলমান ও হিন্দু-যুগে) যদি আমরা "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা কল্পনা করি, তাহা হইলে তাহার প্রতিষ্ঠাও যে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথগ্-ভাবে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতেও দেরী লাগে না। আধুনিক কালের "বৃহত্তর বিহার" ও "বৃহত্তর উড়িষ্যা" যেভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা আবার বঙ্গদেশের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর-মাড়ওয়ার," "বৃহত্তর গুজরাট" ও "বৃহত্তর পাঞ্জাব" হইতে পৃথক্। ইংরেজের "বৃহত্তর ইংলাণ্ড" লইয়া ইংরেজ জাতি গর্ব করিয়া থাকে,

তাহাদের গর্ব করিবার অধিকারও আছে; আরবের "বৃহত্তর আরব", যাহা আরব দেশ ছাপাইয়া এরাক বা মেসোপোতোমিয়া, শাম বা সিরিয়া, মিসর, সূদান, ত্রিপোলি, তুনিসিয়া, আল্-জযাইর বা আল্‌জিয়র্স, মঘ্‌রব বা মরোক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, স্পেন, কর্সিকা, সিসিলি, মাল্টা, পারস্য, মধ্য-এশিয়া এক সময়ে যে "বৃহত্তর আরবদেশ"-এর পর্যায়-ভুক্ত ছিল, সেই "বৃহত্তর আরব" লইয়া খালি আরব কেন, আরব-জাতির মাওয়ালী বা শিষ্য, অথবা ভাব-জগতের প্রজা, অন্য মুসলমান জাতিও গর্ব করিয়া থাকে। প্রাচীন-কালে ভারতের ভাব-রাজ্যের, ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসারের ফলে, এশিয়ার প্রায় সর্বত্র যে "বৃহত্তর ভারত" সংস্থাপিত হইয়াছিল, যাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা সেরিন্দিয়া বা প্রাচীন মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীন বা ব্রহ্ম-শ্যাম-কম্বোজ-চম্পায়, ইন্দোনেসিয়া বা মালয়দেশ ও দ্বীপময়-ভারতে, তথা ভোট বা তিব্বত, চীন, আনাম, কোরিয়া ও জাপানে দেখিতেছি, তাহা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের অবদান,—আমরা অধঃপতিত ভারতীয়েরা এই কথা স্মরণ করিয়াও এখন ধন্য হইতে পারি। কিন্তু এখনকার "বৃহত্তর ভারত"? যে ভাবে আড়কাঠির সাহায্যে কুলী চালান দিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, ফিজি, গায়েনা প্রভৃতি দেশে নূতন বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কি আমাদের বুক দশ হাঁত হইতে পারে? এই বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে—অথবা নিগ্রো ক্রীতদাসদের আগমনের ফলে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে যে "বৃহত্তর আফ্রিকা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে—কেহও কি "বৃহত্তর ইংলাণ্ড"-এর তুলনা করা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে?—"রামচন্দ্র" ও "রামছাগল", উভয়ের মধ্যে "রাম" "শব্দটী সাধারণ—অতএব এই দুই শব্দ সামান্য-ধর্মী—ইহা এই ধরণের হাস্যজনক কথা হইবে।

আধুনিক "বৃহত্তর বঙ্গ" আমরা জানি। ইহার যে কোনও সার্থকতা

ছিল না, ইহার দ্বারা যে ভারতের কোন কাজ হয় নাই, তাহা কেহ বলিবে না। কিন্তু রামদাস দ্বারা অনুপ্রাণিত শিবাজী কর্তৃক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বৃহন্মহারাষ্ট্র যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও যে ভাবে তাহা অষ্টাদশ শতকে পেশওয়াদের দ্বারা ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হয়, তাহা বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া পশ্চিমে ও দক্ষিণে একটু ঘুরিয়া আসিলেই বুঝিতে পারা যায়; এবং তদ্দর্শনে মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী ও মহারাষ্ট্র-সরস্বতীর নিকটে, মহারাষ্ট্র-শক্তি ও মহারাষ্ট্র-বুদ্ধির সমক্ষে, মস্তক অবনত না করিয়া পারা যায় না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষণ এই বৃহন্মহারাষ্ট্র দ্বারাই হইয়াছিল। এ কথা সত্য বটে, সর্বত্রই যে বৃহন্মহারাষ্ট্র, রামদাস ও শিবাজীর এবং রামশাস্ত্রী ও বালাজী বাজী রাওয়ের মহান্ আদর্শ—"গো-ব্রাহ্মণ" রক্ষার আদর্শ (অর্থাৎ হিন্দুর সংসার ও সমাজ এবং হিন্দুর জ্ঞান ও সাধনা রক্ষার আদর্শ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা নহে; বাঙ্গালাদেশে নাগপুর হইতে কতকগুলা মার-হাট্টা লুঠেরা ("বারুগীর্") আসিয়া, পশ্চিম বাঙ্গালার প্রজাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি "বর্গী" নামের সঙ্গে এখনও জড়িত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ অপচার দুই-দশ স্থলে হইয়াছিল বলিয়া, আদর্শের মহত্ত্ব এবং অন্যত্র তাহার কার্যকারিতা খর্ব হয় না। উত্তর-ভারতের হিন্দী কবি ভূষণ যে বলিয়াছিলেন, শিবাজী আসিয়া হিন্দুর "চোটী বেটী রোটী" অর্থাৎ হিন্দুর মাথায় শিখা বা ধর্ম, হিন্দুর মেয়ের সম্মান, এবং হিন্দুর রুটী অর্থাৎ অন্ন বা অর্থ-নৈতিক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য উক্তি। বিজেতা ধর্মান্ধ মুসলমান —কি বিদেশী মুসলমান, কি হিন্দু-সন্তান মুসলমান—যেখানে যাহা ভাঙ্গিয়াছিল, ধ্বংস করিয়াছিল, লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুশক্তি তাহার উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে

জীয়াইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে উত্তর-ভারতে, কাশীতে এবং অন্যত্র, সংস্কৃত-বিদ্যা রক্ষা পাইয়াছিল—অনেকটা পেশোয়াদের পৃষ্ঠ-পোষিত মহারাষ্ট্র পণ্ডিতদের চেষ্টায়। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির, কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দির, মহারাষ্ট্রীয় রাণী অহল্যাবাঈয়ের কীর্তি। উজ্জয়িনীতে গিয়া দেখিলাম, মহারাষ্ট্র রাজশক্তির প্রভাবেই অত বড় হিন্দুতীর্থটা পুনরায় প্রাণ পাইয়া টিঁকিয়া আছে। সুদূর দক্ষিণে তামিলদেশ তাঞ্জোরেও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর পূর্ণ প্রভাব। এ একেবারে অন্য জিনিস; এ জিনিস উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে ও তৃতীয়-পাদে বাঙ্গালী কিছু-কিছু বুঝিতে পারিত—কিন্তু হিন্দু নামের মর্যাদা যাহারা ভুলিতে বসিয়াছে এমন অতি-আধুনিক বাঙ্গালী এ জিনিস বুঝিবে না।

ইংরেজদের middlemen হইয়া, অর্থাৎ তাহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া আমাদের হালের বৃহত্তর-বঙ্গের প্রসার। ইহা নায়েবী গোমস্তা-গিরি দারোগাগিরির মতই ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যকার আত্মপ্রসাদের যে কিছুই নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী তাহার এই তল্পিদারীর, এই ফড়িয়াগিরির অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। ইংরেজী শিখিয়া বাঙ্গালী যে জিনিসটী ভারতবর্ষের অন্য সব জাতির তুলনায় অনেক আগেই পাইয়াছিল—তাহার মনের আধুনিকতা, মনের সংস্কার-মুক্ত ভাব—তাহা তাহাকে এমন একটী স্থানে উন্নীত করিয়াছিল যেখানে উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধেও সাধারণ ভারতবাসীর (বিশেষতঃ অ-বাঙ্গালী ভারতবাসী) পক্ষে পঁহুছানো, একেবারে অসম্ভব না হইলেও, বিশেষ কঠিন ব্যাপার ছিল। দুইটী জিনিস বাঙ্গালী তাহার ইংরেজ গুরুর নিকট পাইয়াছিল,—জ্ঞানলিপ্সা অর্থাৎ নূতন খবর, বাহিরের জগতের খবর জানিবার

আকাঙ্ক্ষা ;—এবং স্বাধীন চিন্তা। তাহার স্বাধীনতার স্পৃহা এবং জাতীয়তার উন্মেষও এই স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই উদ্ভূত হয়।

বঙ্গের বাহিরে গিয়া বাঙ্গালী চাকুরিজীবী এই দুইটী বস্তু ভারত-মাতার সেবায় উপস্থাপিত করিল। প্রবাসী বাঙ্গালী উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র যেখানে-যেখানে গিযাছে, প্রায় সর্বত্রই ইংরেজী ইস্কুল খুলিয়াছে, অথবা ইংরেজী ইস্কুল খুলিতে সাহায্য করিয়াছে ; ইংরেজী শিক্ষার—অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। টাকা-কড়ি দিয়াছে, জমি দিয়াছে, বিনা বেতনে পরিশ্রম করিয়াছে। এই শিক্ষা-প্রচার দ্বারা, বিচার করিয়া দেখিলে, এক হিসাবে সে নিজের পায়েই কুড়ুল মারিয়াছে ; স্থানীয় লোকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত হইলে, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা যে ও-সব দেশে আর থাকিবে না, সে কথা প্রবাসী বাঙ্গালীরা চিন্তা করেন নাই ;—এই সকল ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রাদেশিক স্বার্থবোধ তাঁহাদের একেবারেই ছিল না, সমগ্র ভারতের হিতৈষণা ইহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বাঙ্গালী উকিল ও অন্য স্বাধীন ব্যবসায়ীর হাতে ইংরেজী সংবাদপত্র দ্বারা রাজনৈতিক শিক্ষাও প্রসৃত হয়। বাঙ্গালীই ভারত-মাতার কল্পনা ও বোধ ভারতময় প্রচার করে, "স্বদেশী" মন্ত্র বাঙ্গালীর দ্বারাই প্রচারিত। রাজসরকারে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা আগে যাহা ছিল, তাহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, শিক্ষা ও দেশাত্মবোধের মন্ত্র বাঙ্গালী যখন প্রচার করিল, ভারতের লোকেরা তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না,—বাঙ্গালার বাহিরের লোকেদের চরিত্রে এ বিষয়ে গ্রহণ-শক্তিও যথেষ্ট ছিল।

আধুনিক বৃহত্তর বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে চাকুরীগত-প্রাণ মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের দ্বারা। এইরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতে সব প্রদেশে নাই, বা ছিল না। চাকুরী-জীবী ছাড়া, বাঙ্গালী কারিগর

ও ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরে ও কাশীতে কিছু-কিছু আছে, এবং বহু তীর্থবাসী কাশী ও বৃন্দাবনে প্রবাসী হইয়া আছেন। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা, উভয়ই বৃহত্তর বঙ্গে বিদ্যমান। নিজের সম্প্রদায়ের বা সামাজিক গণ্ডীর বাহিরে কিছু দেখিলে, সে জিনিসকে সহজে বুঝিতে না পারা, বা বুঝিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টা না করা—ইহা এক সাধারণ সঙ্কীর্ণতা ; বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত নহে। এই সঙ্কীর্ণতার আনুষঙ্গিক আর একটী অবগুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিদ্যমান—অনুচিত দম্ভ বা অহমিকা। অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত কতকগুলি সাধারণ গালি এই সঙ্কীর্ণতা ও দম্ভ হইতে উদ্ভূত। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে-সঙ্গে আবার আত্মভোলা উদারতাও দেখা যায়।

বাঙ্গালী যেখানে-সেখানে বাস করিয়াছে, তাহার শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সে সাধ্য-মত সেখানকার লোকেদের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু—

The evil that men do lives after them ;

The good is oft interred with their bones,

—প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। ইংরেজী শিক্ষার ফলে, উত্তর-ভারতের নানাস্থানে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। যেখানে এই শ্রেণীর অভাব বা অল্পতা ছিল, ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ায়, এবং ইংরেজী-শিক্ষিত কেরানী ও কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ইত্যাদির আবশ্যকতা হওয়ায়, এই শ্রেণী বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র দেখা দিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী ইংরেজী ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং শিক্ষাদানে ও অন্য রূপে, ইংরেজের সহায়তা করিয়া, বাঙ্গালার বাহিরে এই শ্রেণীর উদ্ভবে অংশ-গ্রহণ করিয়াছে।

যেমন-যেমন এক-এক পুরুষের লোক অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, তেমন তেমন এখন তাহাদের কৃত জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা বাঙ্গালার বাহিরের লোকেরা ভুলিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালীর উদারতার কথা ভুলিয়া যাইতেছে,—কিন্তু বাঙ্গালী যে সরকারের পিয়ারা ছিল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ-কেহ যে তুচ্ছতার সহিত বাহিরের লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করিত, সে কথা তাহারা মনে করিয়া রাখিতেছে। এখন সরকার ও জনসাধারণ এক হইয়াছেন—অবস্থা-গতিকে প্রবাসী বাঙ্গালীর উচ্ছেদ-সাধন ঘটিতেছে। ইহার উপর বিধাতার মার আছে; বিহারের ভূমি-কম্পে কয়েক মিনিটের মধ্যে বিগত তিন-চারি পুরুষ ধরিয়া বিহারে বাঙ্গালী যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার অনেকখানি ভূমিসাৎ হইয়া গেল; বিহারে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন হতশ্রী, মৃতপ্রায়।

দক্ষিণভারতে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর যেন আবশ্যকতা হয় নাই, কাজেই বাঙ্গালী চাকুরিয়াকে সেখানে যাইতে হয় নাই। ওদিকে বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনের প্রসাদে তেলুগু, তামিল ও মালয়ালী কেরানী আসিয়া এখন বাঙ্গালীর ঘরের ভিতর চড়াও হইতেছে।

এই অবস্থার প্রতীকার কি? "বৃহত্তর বঙ্গ"র দুরবস্থা বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির নিজের দুরবস্থারই অংশ মাত্র। বাঙ্গালা দেশের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর—জীবন-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ এ-দিকে তেমন কেহ চিন্তা করিতেছেন না। "ওরিএণ্টাল" নৃত্য, তরুণী-নৃত্য, বিভিন্ন সিনেমাওয়ালাদের নব-নব "অবদান," যৌনতত্ত্ব লইয়া রচিত উপন্যাস, সহ-শিক্ষা, ফুট্‌বল, এবং অবসর মত একটু-আধটু নিজ পঙ্গু সমাজের নিন্দা-কটূক্তি ও সঙ্গে-সঙ্গে "রাশ্যা" অর্থাৎ রুষদেশের প্রগতির প্রশংসাময় আলোচনা—এই পথে আমাদের যুবকদের মন চালিত হইতেছে। নিজ পারিপার্শ্বিকের, অর্থাৎ যে সমাজের মধ্যে

আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার কোনও কাজ করিবার কথা উঠিলে, সমগ্র ভারতীয় অথবা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রসঙ্গ তুলিয়া এ সমস্ত ছোট কথা চাপা দিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। হিন্দু হিন্দু-সমাজের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে আমরা communalism বলিয়া গালি দেই। দেশের ভিতরে তো আমাদের এই অবস্থা। বাহিরের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবারই সময় পাই না—প্রতীকারের চিন্তা তো দূরের কথা।

বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলের কতকগুলি চিন্তাশীল প্রবাসী বাঙ্গালী, যাঁহারা নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে চিন্তিত এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সম্বন্ধে ভীত, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি —চাকুরীর দিকে তাকাইয়া থাকিলে "বৃহত্তর বঙ্গ" আর টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই প্রবাসী বাঙ্গালীকে ঝুঁকিতে হইবে। এ-দিকে প্রতিযোগিতা খুবই আছে, তবে ঈর্ষাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আত্মলঘুতাবোধপূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই,—যে-প্রকারের প্রতিযোগিতা চাকুরীর ক্ষেত্রে ও "ভদ্রলোক"-শ্রেণীর লোকের ব্যবসায়ে বিদ্যমান দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সকল বাণিজ্য ও ব্যাপার, সেগুলির একটা বড় অংশ প্রবাসী বাঙ্গালীদের হাতেই থাকা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বেনারসী কাপড়ের কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্র-গৃহস্থের বিবাহে বেনারসী জোড় ও সাড়ী (অভাবে বিষ্ণুপুরের চেলীর জোড় ও সাড়ী) না হইলে চলে না। বেনারসীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন জরীর কাজযুক্ত চেলী বা রেশমের বস্ত্র বিষ্ণুপুরে এখনও তৈরী হয় নাই, তবে হওয়া উচিত; এতদ্ভিন্ন, বেনারসী জরীর কাজের কাপড়ের একটা আভিজাত্য আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে

বেনারসী কাপড়ের এত আদর থাকায়, এ ভীষণ দুর্দিনেও বেনারসী বস্ত্র-শিল্প কতকটা রক্ষা পাইয়াছে—এ-কথা বেনারসী কাপড়ের ব্যবসায়ীর মুখে শুনিয়াছি। এই কাজ কাশী-প্রবাসী বাঙ্গালী কিছু-কিছু হাতে লইয়াছেন। আরও বেশী লোকের এই প্রকারের কাজে নামা উচিত। বাহির হইতে যে ঘিয়ের, মাছের ও অন্য খাদ্য-দ্রব্যের চালান আসে, সেদিকেও আমাদের অবহিত হইতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের মাল যাহা বাঙ্গালার বাহিরে অন্য প্রদেশে যায়, তাহা যথা-সম্ভব প্রবাসী বাঙ্গালীর হাত দিয়া যাহাতে যাইতে পারে তদ্বিষয়েও চেষ্টা করা উচিত। ব্যাপারটী সোজা বা সহজ-সাধ্য নহে। এক তো আমাদেব বাণিজ্যের উপযুক্ত বুদ্ধি বা তদ্বিষয়ে রুচি নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূলতা অনেক। পয়সা-উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনও sentiment বা সুকুমার ভাব নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহারা টাকা করিতে নামে তাহারা (অন্য বহু ব্যবসায়েরই মত) অনেক সময়ে নির্মম হৃদয়হীনতার ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালার সহিত গুজরাটের কল-ওয়ালা ও বণিক্‌দিগের ব্যবহার আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

বৃহত্তর বঙ্গে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চেষ্টা—আমার মনে হয়, এ বিষয় এখন কিছুকালের জন্য ধামা-চাপা থাক্। এখন ঘবে আগুন লাগিয়াছে, সাহিত্যিক ব্যসনের সময় এখন নাই। প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা ঘরে বাপ-মায়ের সঙ্গে বাঙ্গালা বলিবে, এবং অন্ততঃ বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটুকু হইলেই যথেষ্ট। যাতায়াতের সুবিধার প্রসাদে বঙ্গের সঙ্গে "বৃহত্তর বঙ্গ"র যোগ-সূত্র সহজে নষ্ট হইবার নহে; বৈবাহিক আদান-প্রদান যতদিন স্বশ্রেণীর বা স্বজাতির মধ্যেই হইবে, ততদিন প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা আম্বেরের 'শিলামাতা' যশোহরেশ্বরীর পুরোহিতদের মত অথবা

করৌলীর গোস্বামীদের মত আর সহজে হইবে না। স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ হইলে, অর্থাৎ বিবাহ-বিষয়ে আধুনিক হিঁদুয়ানী যে ভাবে চলিতেছে তাহা অচল হইলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ঘুচিবার বেশী দেরী আর থাকিবে না।

"বৃহত্তর বঙ্গ" যাঁহাদের লইয়া, তাঁহারা আর একটী জিনিস সহজে করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা বঙ্গদেশের তথা ভারতের সেবা করিতে পারেন। বাঙ্গালীর সহিত অন্য প্রদেশের লোকেদের, এবং অন্য প্রদেশের লোকদের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় তাঁহাদের দ্বারাই ভাল করিয়া হইতে পারে। এই কাজের জন্য তাঁহাদের মাতৃভাষা ভাল করিয়া শেখা উচিত, এবং স্থানীয় ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষার মত করিয়া লওয়া উচিত। হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া সাহিত্যে কতকগুলি বাঙ্গালী সম্মানের স্থান করিয়া লইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে কম আনন্দের ও গৌরবের কথা নহে। রাধানাথ রায়, অমৃতলাল চক্রবর্তী, বাবু যমুনাদাস, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—ইঁহারাই যথার্থ বৃহত্তর-বঙ্গের সেবক। হিন্দী, উর্দু, রাজস্থানী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, মারহাট্টী প্রভৃতি ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করা—এ দিক্ দিয়াই তাঁহাদের বঙ্গবাণীর সেবা সার্থক হইতে পারে। অবশ্য যাঁহার শক্তি আছে, যে অবস্থায় থাকুন না কেন সেই অবস্থাতেই তিনি সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ" ধরিব না—সেখানে "বৃহত্তর ভারত" বিদ্যমান,—সেখানে দু-পাঁচজন বাঙ্গালী থাকিলে একত্র মিলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা গান, বাঙ্গালার বিশিষ্ট সংস্কৃতি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশীদের সমক্ষে বিশেষ ভাবে বাঙ্গালার

তিলক কপালে পরিয়া বেড়াইলে, সমগ্র ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য একত্বের বিরুদ্ধেই কার্য করা হইবে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারতের বাহিরে কোথাও "বৃহত্তর বঙ্গ" গড়িয়া উঠে নাই। বর্মা—সে তো এতাবৎ ভারতেই অংশ হইয়া ছিল। বর্মায় প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী মুসলমান (কৃষক ও নাবিক শ্রেণীর লোক) যায়, কিছু-কিছু কেরানী যায়; অন্য প্রদেশ হইতে তেলুগু ও তামিল কুলি, শিখ পাহারাওয়ালা, হিন্দুস্থানী দরোয়ান, উড়িয়া মালী ও মিস্ত্রী, এবং খোজা ও ভাটিয়া, চেট্টি, চুলিয়া ও লাব্বে যায়। তাহারা এতাবৎ বর্মীদের সংস্কৃতিতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। সকলেরই এক উদ্দেশ্য—কোনও রকমে বর্মার মাটি হইতে বা বর্মার লোকেদের কাছ হইতে পয়সা উপার্জন করা, অথবা চাকুরী-জীবী হইলে, কোনও রকমে চাকুরীটুকু বজায় রাখা। বর্মায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অভাব নাই; এবং বর্মী জানেন, বেশ ভাল রকম বর্মী জানেন, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীও অপ্রচুর নহে। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী হিন্দু বর্মার বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ভাব-গত আত্মীয়তা বাড়াইয়া তুলিতে পারিয়াছেন? ভারতবর্ষীয়েরা বর্মীদের কাছে "কালা খোয়ে" অর্থাৎ "সাগর পারের কুকুর" মাত্র রহিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে ক্রমে একটী তীব্র ভারতীয়-বিদ্বেষ দেখা যাইতেছে—তাহার বহু নিষ্ঠুর পরিচয় আমরা খবরের কাগজে পড়িতেছি। ভারতীয় সংস্কৃতি বর্মীদের দ্বারে পহুঁছাইয়া দিতে কয় জন চেষ্টা করিয়াছেন? বর্মীদের সম্বন্ধেও আমরা কতকটা অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছি—তাহাদের ব্যবহারিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনও খবর আমাদের কাছে পহুঁছায় নাই।

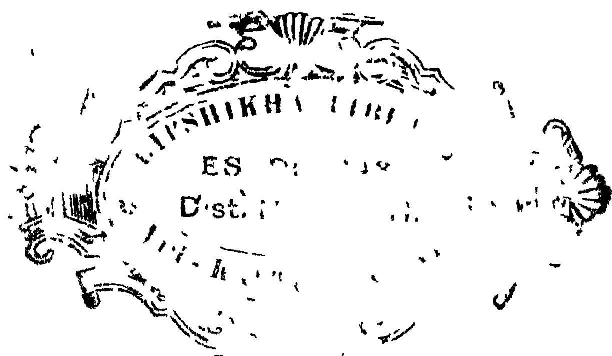
বর্মার বাহিরে অন্যত্র বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। শ্যামদেশে দুই এক জন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কেরানী; মালয়েও তাই, অধিকন্তু দুই

চারিজন ব্যারিস্টার; পূর্ব-আফ্রিকায়, কেনিয়ায় ও তাঙাফ্রিকার দুই-চারিজন বাঙ্গালী আছেন শুনিয়াছি। ইংলণ্ডে, ফ্রান্স, জর্মানীতে কিছু কিছু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী গুরুকুল-বাস করিতে যান মাত্র, স্থায়ী ভারতীয় অধিবাসী খুবই কম। সুতরাং ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা উপস্থিত ক্ষেত্রে কাজের কথা নহে।

উপসংহারে খালি এই কথা বলিতে চাই—বাঙ্গালী ঘরে বড় হইলেই বাহিরেও বড হইবে। "বৃহত্তর বঙ্গ"-কে একটী জীবন্ত আদর্শ হিসাবে সার্থক করিতে গেলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর দায়িত্ব খুবই আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ দায়িত্ব, ঘরবাসী বা বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর। বাঙ্গালা চারিত্র্য-যুক্ত হইলে, ঘরে-বাহিরে, পথে-প্রবাসে সর্বত্র তাহার জয় হইবেই।

"বৃহত্তর বঙ্গ", "বৃহত্তর বঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজের middleman হইয়া, ইহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া যে বৃহত্তর-বঙ্গের প্রতিষ্ঠা, তাহার কোনও স্থায়ী ফল দেখা যাইতেছে না। উৎকট বাঙ্গালীয়ানা লইয়া বাঙ্গালী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য যে অস্ত্র, আত্ম-প্রসারের জন্য সে অস্ত্র অনেক সময়ে মোটেই উপযোগী হয় না। সমগ্র ভারতের একাত্মতা-বোধ ভিন্ন আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্য হওয়া সম্ভবপর নহে। এক প্রদেশ কর্তৃক অন্য প্রদেশের উপরে আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রভাব চলিতে পারে না; অর্থ-নৈতিক প্রভাব বা চাপ কখনও কেহ সহ্য করিবে না। গুজরাট, মারওয়াড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের অর্থ-নৈতিক exploitation বা শোষণ আমাদের প্রাণপণে প্রতিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু ঐ সব প্রদেশ হইতে যদি আমরা

কোনও মানসিক বা আধ্যাত্মিক বস্তু পাই, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব। সমগ্র ভারত এক, ভারতের অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য একত্ব—এই বোধ আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান; ইংরেজের শাসনে নূতন যুগে এই কথাই বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে শুনাইয়াছে—ইহাতেই তাহার প্রধান গৌরব; বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ ভূদেব রবীন্দ্রনাথের বাণী, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ভারতের একতাবোধকে দৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল; তাই ১৯০৪ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত বাঙ্গালীর নেতৃত্ব সমস্ত ভারত এক রকম মানিয়াই লইয়াছিল। অবশ্য বাঙ্গালীর কল্পনা ও চিন্তাশক্তি এবং শিক্ষা-বিষয়ে যোগ্যতা ইহার মূলে ছিল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেমন জ্ঞান ও শক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, এদিকে তেমন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমরা শক্তিহীন হইতেছি। ঘর সামলাইয়া লইলেই বাহির আপনা হইতেই নিজেকে সামলাইবে। জ্ঞানে, চারিত্র্যে, কর্মশীলতায় বাঙ্গালা আবার যখন বড় হইবে, এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত যথার্থ মানুষের সংখ্যা যখন বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশী করিয়া হইবে, তখনই বাঙ্গালী যেখানেই যাইবে, সেখানেই নূতন-ভাবে এক গৌরবময় "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে॥



কাশী

তিন বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে গুরুকুল-বাস করিয়া দেশে ফিরিয়াছি। বিদেশের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নগর দেখিয়া আসিয়াছি—এডিন্‌বরা, অক্‌স্‌ফোর্ড, পারিস্, বার্লিন, ড্রেস্‌ডেন, ন্যুরন্‌ব্যার্গ্, মিউনিক্, মিলান, জেনোয়া, পিসা, ভেনিস, ফ্লরেন্স, রোম, নেপল্‌স্, আথেন্স; সৌধে দেবায়তনে চিত্রশালায় অমরাপুরীবৎ সুন্দর এক-একটী নগরী; আবার ইহাদের প্রত্যেকটীই কোনও-না-কোনও প্রকারের শিল্প-কার্যের জন্য বিখ্যাত—ফরাসীতে যাহাকে বলে Ville d'Art—কলা-নগরী বা শিল্পসুষমাময় নগরী। ইহাদের মধ্যে একটীতে—পারিস্ এ—প্রায় বৎসরকাল ধরিয়া বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, এবং এই শহরকে মনে-প্রাণে ভালবাসিতেও আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই সমস্ত শহর কত প্রাচীন কীর্তি, মধ্য-যুগের ও কচিৎ প্রাচীন-যুগের ইউরোপের কত প্রাচীন স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও এই নগরগুলি অতুলনীয়—কোথাও নদী, কোথাও বা পর্বত, কোথাও বা সাগর এই সকল স্থানকে নয়নাভিরাম করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষের কৃতি শিল্প, দুইয়ে যেন প্রতিযোগিতা করিয়া, এই সব শহরকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ইউরোপে বাস ও ভ্রমণের কালে যখন এই সব নগর দেখিতাম, তখন অহরহঃ আমাদের দেশের একটী নগরের কথা মনে জাগিত, এবং আবার ভাল করিয়া সেই নগর দেখিবার জন্য ও তাহার ভাব-ধারায় স্নান করিবার জন্য মনে এক বিপুল আকাঙ্ক্ষাময় আবেগ আসিত। সেই

নগরটী হইতেছে কাশী। বাহিরের অনেক ভাল জিনিস দেখিয়া আসিয়া, তুলনা করিয়া ঘরের কোনও জিনিস যে সত্যই সুন্দর তাহা যখন বুঝিতে পারা যায়, তখন বাস্তবিকই মনে একটা আনন্দ জাগে। সত্যই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর Ville d'Art গুলির মধ্যে যে কাশী অন্যতম, একথা জোর গলায় বলা যায়। আমরা বাঙ্গালীরা এই হিসাবে দুর্ভাগ্য—কাশী বা মথুরা, জয়পুর বা আগরার মত একটী কলা-নগরী বাঙ্গালা দেশে গড়িয়া উঠিল না। এইরূপ একটীমাত্র নগরী সারা বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দেখা যায়,—সেটী হইতেছে বিষ্ণুপুর; বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্পকার্যে বাঙ্গালা-দেশের সমস্ত নগরগুলির শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জন-সাধারণ চিনিল না, দেখিল না, আদর করিতে শিখিল না।

এমন বাঙ্গালী কে আছে, এমন ভারতীয় হিন্দুও কে আছে, কাশী যাহার ভাল লাগে না? কোন্ কৈশোর বয়সে, সেই দূর স্বপ্নের মত ২৫।২৬ বৎসর পূর্বেকার কালে, প্রথম কাশী দেখিয়াছিলাম। তখন কাশীর প্রবহমান জীবনের দৃশ্যপটগুলিতে যে মোহন তুলিকাপাত দেখিয়াছিলাম, সে তুলির টান আমার সোনার কাশী হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। রাজঘাট স্টেশনে নামিয়া, একখানি এক্কা করিয়া সুদীর্ঘ পথ ধরিয়া বাঙ্গালীটোলায় আসি, আমার এক পিসিমা কাশীবাস করিতেছিলেন, তাঁহার বাসায় আসিয়া উঠি। কলিকাতায় ট্রাম ও ঘোড়ার গাড়ী মুখরিত, জনাকীর্ণ ও আমার চোখে বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য-হীন রাস্তার অতি সুপরিচিত এক-ঘেয়েত্বের পরে—তবুও সে যুগে তখন মোটর-গাড়ীর এত ছড়াছড়ি ছিল না, এবং বাস্ তখনও হয় নাই—কাশীর রাস্তাতেই আমায় চিত্ত হরণ করিল। এ জিনিস যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত-রূপে সুন্দর; কলিকাতায় বসিয়া-বসিয়া, প্রাচীন ভারতের

সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা যেন মূর্তিমতী হইয়া এই কাশীতেই আমার নিকট ধরা দিল। কলিকাতায় কাশীর লোকের অসদ্ভাব নাই—কিন্তু কাশীর রাস্তায় তাহাদের দেখিয়া অন্য রকম লাগিল। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে আলোকিত ও উত্তপ্ত রাস্তা; বিরাট্‌কায় তিনটী করিয়া বলীবর্দের দ্বারা বাহিত গোযান,—গোরু ও গাড়ীর আকার এবং গাড়ীর চাকা, সবই আমাদের বাঙ্গালা-দেশের তুলনায় কতটা বড এবং কতটা শক্তির ব্যঞ্জক! খোলার-চালের গাড়ীর শ্রেণীর মাঝে-মাঝে দুই-একখানা করিয়া ইটের বা পাথরের ইমারত; সব-চেয়ে চমৎকার লাগিল, পাথরের বারান্দাগুলি,—বাড়ীর ছাতের ধারে অনুচ্চ পাতলা-পাতলা পাথরের আলিসাগুলি যেন রোমান্সের আকর স্বরূপ দণ্ডায়মান—সেগুলিতে আবার একটু করিয়া রেখা টানিয়া বা পদ্মপাতার নক্‌শা কাটিয়া খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে। জরীর পাড় দেওয়া লাল হ'লুদে সবুজ বেগুনে' নানা রঙের দুপট্টা বা চাদর পরিয়া অত্যন্ত শালীনতার সহিত সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া, কাশীর মেয়েরা— গিন্নী ঝী বৌ সকলে গঙ্গা-স্নান সারিয়া ফিরিতেছে; ইহাদের গতি-ভঙ্গী কেমন শুদ্ধ ও সুন্দর লাগিল! নথ-নাকে, হ'লুদে কাপড-পরা দুই একটী ছোট মেয়ে—কন্যা-রূপিণী গৌরী-মাতা হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া যেন কাশীর রাস্তায় অবতীর্ণা। এক্কা গাড়ীর গাড়োয়ান, গাড়ীর সামনে মেয়েরা আসিয়া পড়িলে হাঁক দিতেছে—'এ মাঈ, এ মা-জী!' পুরুষ আসিলে বলিতেছে 'এ ভৈয়া, এ দাদা!'—কই, ইহারা তো কলিকাতার গাড়োয়ানদের মত পথচারী পথিকের সঙ্গে গর্বদৃপ্ত-ভাবে দুর্ব্যবহার করে না! পরে যখন কাশীর ঘাটের শোভা দেখিলাম— পিসিমার সঙ্গে ঘাটের উপর দিয়া হাঁটিয়া-হাঁটিয়া কেদার-ঘাট হইতে বিশ্বনাথ-দর্শনের জন্য দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত আসিলাম, তখন উদার

প্রস্তরময় সোপানরাজি ও উচ্চশীর্ষ প্রাসাদাবলী আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। 'কি সুন্দর। কি সুন্দর!'—এই এক কথায় আবৃত্তি ছাড়া ভাষায় আর কথা কুলাইল না।

তার পরে বহুবার কাশী গিয়াছি। কিন্তু কাশীর সেই প্রথম দিনের মোহ আর কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না। কাশীর পরিবর্তন অনেক হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কাশীর ভিতরকার রহস্য, কাশীর কাশীত্ব—এখনও যেন যাইয়াও যায় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার কাশীখণ্ডে সমসাময়িক কাশীর যে জীবন্ত ও উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন, আধুনিক কাশীতে সেই চিত্রের অনেকটা এখনও পাওয়া যায়। ভেনিস্-এর কানাল্-গ্রান্দের খালের পাড় দিয়াই বেড়াই, বা মিউনিকে Isar ইজার নদীর সগর্জন দ্রুত বেগই দেখি, বা পারিসে বিকালে এক পশলা বৃষ্টির পরে আকাশে মেঘের গায়ে আর শহরের পুরাতন বাড়ীর দেওয়ালে আর রাস্তার ধারের গাছপালায় নানা অপূর্ব-সুন্দর রঙের সমাবেশই দেখি—কাশীর ঘাটে বসিয়া, লোকেদের স্নান-আহ্নিক দেখিতে-দেখিতে গঙ্গার সুশীতল বায়ুর জন্য প্রাণের ভিতরে যেন হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিত।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে আবার কাশীতে আসিলাম—এক পূজার ছুটীতে। বোধ হয় পাঁচ বৎসর পরে কাশীর পুনর্দর্শন। ইহার মধ্যে অনেক কিছু দেখিয়া আসিয়াছি, জীবনে অনেক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। পিসিমা বহুদিন হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন—এবার উঠিলাম অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। হালের বিলাত-ফেরত—আমার স্নানের জন্য ঘরের ভিতরে জলের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া, নিজেই একটু তেল চাহিয়া লইয়া, গামছা কাঁধে ফেলিয়া, গঙ্গায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। অগত্যা আত্মীয়টীও সঙ্গে চলিলেন—কিন্তু ইহাতে

তিনি যে অখুশী হইলেন তাহা বলিতে পারি না। খালী পায়ে বাঙ্গালী-টোলার চির-পরিচিত সেই-সব সরু গলি দিয়া আসিলাম। হাতী-ফটকার কাছে দেওয়ালের গায়ে কালো রঙে আঁকা হাতীটা এখনও রহিয়াছে, কিন্তু রঙটা জুবড়িয়া গিয়াছে, রেখাগুলি আর তেমন সুস্পষ্ট নাই। পাঁড়ে-ঘাট বাড়ীর কাছে পড়ে, পাঁড়ে-ঘাটেই আসিলাম। ছোট ঘাটটী, ঠিক যেন ঘরোয়া ব্যাপার। যাহারা নাহিতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালীই বেশী—ঘাটটী বাঙ্গালা দেশের কোনও স্থান বলিয়া যেন ভ্রম হয়। পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে চাতালের উপর জন তিনেক ঘাটোয়াল ব্রাহ্মণ, বিরাট বাঁখারির ছাতার তলে বসিয়া স্নান-নিরত 'যজমান'দের কাপড় আগলাইতেছে, কোথাও বা সদ্য-স্নাত শিশুদের চন্দন পরাইয়া দিতেছে। জল অনেকটা নামিয়া গিয়াছে—ঘাটের উপরিভাগে সিঁড়ির ধাপের পাশে পাশে দণ্ডীদের জন্য যে কতকগুলি ঘর আছে, জল চলিয়া যাওয়ায় তাহার দুই একখানা খালি হইয়াছে। শরতের রৌদ্রে চারিদিক উদ্ভাসিত। পাশেই মুন্সী-ঘাট ও দারভাঙ্গা-ঘাটের বিরাট্ ও সু-উচ্চ প্রস্তরময় সৌধাবলী— কল-নাদিনী প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গার পবিত্র কূলে যেন বাস্তু-শিল্পের ধ্রুপদ সঙ্গীত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছু দূরে অহল্যা-ঘাটের পরেই দশাশ্বমেধ-ঘাটের লাল পাথরের মন্দিরটী, চূড়ার উপর বট ও অশ্বত্থ গাছ গজাইয়াছে। ঘাটের মাথার উপরে, পাথরের ফটকের পাশে দুই-একটী অশথ গাছ, হাওয়ায় তাহাদের সবুজ পাতা কাঁপিতেছে। আকাশের হাসি, নদীর স্বচ্ছ জলের একটানা স্রোতে যেন প্রতিফলিত হইয়াছে। বহুক্ষণ ধরিয়া মুগ্ধ নেত্রে এই শান্ত সৌন্দর্য দেখিলাম—নয়ন যেন তৃপ্ত হইতে চাহে না। তারপরে গঙ্গায় স্নান—সে স্নানে কি তৃপ্তি! যদিও শহরের সমস্ত ময়লা জল দুই-তিনটা নহর দিয়া এই সব ঘাটের পাশ দিয়াই বহিয়া

আসিয়া গঙ্গার জলকে কলুষিত করিতেছে, ইহা চোখের দেখা বলিয়া মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে অপ্রসন্নতা আসিতেছিল তাহা হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি নাই।

কাশীর আবর্জনা, কাশীর পঙ্কিলতা সত্ত্বেও, বাস্তবিকই কাশী অপূর্ব স্থান। এই সহর আমাদের হিন্দু সভ্যতার যথার্থ পীঠস্থান। স্থান-হিসাবে আধুনিক কাশী বিশেষ পুরাতন শহর নহে। উত্তর-বাহিনী গঙ্গার তীরে অবস্থিত আধুনিক কাশীতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্বেকার কোন গৃহাদি নাই। কাশীর সব-চেয়ে পুরাতন বাড়ী হইতেছে প্রাচীন বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আকবরের সময়ের তৈয়ারী রাজা মানসিংহের প্রাসাদ—আধুনিক মান-মন্দিরের প্রাচীন অংশ, যে অংশে ভারতীয় বস্তুশিল্পের এক অপূর্ব সৃষ্টি, মান-মন্দিরের বিখ্যাত ঝরোখাটী, ঘাটের উপরে প্রলম্বিত হইয়া আছে—মানমন্দিরের সেই অংশ আর একটী উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ইমারত। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দির অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক প্রস্তুত হয়। মুখ্যতঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকেই আধুনিক কাশী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন কাশী ছিল সারনাথের দিকে, বরুণার ধারে। তাহার পরে কাশী দক্ষিণে গঙ্গা ধরিয়া বিস্তৃত হয়। উপনিষদের যুগ হইতে কাশি-জাতির কথা শুনা যায়। বুদ্ধদেব যখন তাঁহার বাণী প্রথম প্রচার করিতে ইচ্ছুক হন, তখন তিনি সারনাথের নিকট অবস্থিত কাশীতেই আগমন করেন। কাশী শিব-স্থান রূপে পরিচিত হয় ইহার বহু পরে। বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া কাশী হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বিদেশের একটী মাত্র শহর আমাদের কাশীর কথা প্রতিপদে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই শহরটী হইতেছে ভেনিস্। কেবল এখানে গঙ্গার বদলে ভেনিসের বৈশিষ্ট্য খালের ছাড়াছড়ি, আর হিন্দু মন্দিরের বদলে

রোমান-কাথলিক ধর্মের গির্জা। কাশীর গলিগুলিতে যেখানে-সেখানে যেমন শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি, ভেনিসেও তেমনি যেখানে-সেখানে, লোকের বাড়ীর দেওয়ালে ছোট-ছোট কুলুঙ্গীতে যীশু বা মা-মেরীর মূর্তি। সকালে স্নানের পর মেয়েরা কাশীতে যেমন এই সব শিবের মাথায় এক কুশী করিয়া গঙ্গাজল আর এক-একটি করিয়া ফুল বা বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিয়া যায়, তেমনি ভেনিসে এই সব যীশু বা মেরীর মূর্তির সাম্‌নে মেয়েরা সন্ধ্যায় একটী করিয়া বাতী জ্বালাইয়া দিয়া যায়, হাত যোড় করিয়া প্রার্থনার মন্ত্রও পড়ে। কাশীতে হিন্দু মধ্য-যুগের জগতের আব-হাওয়া পুরামাত্রায় বিদ্যমান; ভেনিসে তেমনি মধ্য-যুগের ইতালির রোমান-কাথলিক ভাবই প্রবল। কাশীর কাঠের খেলনা, পাথরের কাজ, পিতলের কাজ, সোনা-রূপার কাজ, রেশমের কাজ, কিংখাব, নানা-প্রকার বিলাসের দ্রব্য বিখ্যাত; ভেনিসও তেমনি কতক-গুলি বিশিষ্ট শিল্পের কেন্দ্র—পিতলের ঢালাই কাজ, কাচের শিল্প, পাথরের কাজ, সাটিন, কিংখাব। পার্থক্য এই যে, ভেনিসের লোকেরা তাহাদের প্রাচীন নগরের গৌরব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, নগরের প্রাচীন সৌন্দর্য সংরক্ষণে তাহারা বিশেষ ভাবে সচেষ্ট; কিন্তু কাশীর লোকেরা যেন সে বিষয়ে নিতান্তই উদাসীন।

কাশীর গৌরব—তাহার গঙ্গার তীরের ঘাট, এবং তাহার সরু গলিগুলি। ভেনিস্ এবং নেপল্‌স্-এ এইরূপ সরু গলির অসদ্ভাব নাই। তবে সেখানে এগুলিকে যথাবৎ রক্ষা করা হইতেছে, গলিগুলিকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিবার জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয়ও করা হইতেছে। কাশীর মত, গলিগুলিকে অশ্রদ্ধার চোখে না দেখিয়া, এবং পুরাতন প্রাসাদ ও অন্য বাড়ী ভাঙ্গিয়া সেগুলিকে দূরীভূত করিয়া, চওড়া-চওড়া রাস্তা তৈয়ারী করিয়া 'আধুনিক' হইবার চেষ্টা, ইউরোপের

ঐ সব শহরের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের মত উষ্ণ দেশে চওড়া রাস্তায় দিনে অন্ততঃ তিনবার করিয়া প্রচুর জল দিবার ব্যবস্থা না রাখিলে, সেগুলি ধূলায় ধূলাকীর্ণ হইয়া থাকে। রৌদ্রে ও হাওয়ায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ধূলায় কাশীর বড় রাস্তাগুলি যখন নিতান্ত অস্বস্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর হয়, তখন পাথরে-মোড়া বাঙ্গালী-টোলা ও অন্য পুরাতন মহল্লার গলিগুলি পাশের বাড়ীর ছায়ায় কেমন ঠাণ্ডা থাকে, সেখানে ধূলার উৎপাত মোটেই হয় না। সেক্রোল্-এর রাস্তায় একবার হাঁটিয়া ঘুরিয়া আসিলে দস্তুর-মত ধূলি-স্নান হইয়া যায়, পুনরায় ভাল করিয়া স্নান না করিলে গা ঘিণ-ঘিণ করে; পুরাতন কাশীর গলির সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। অথচ সেক্রোল্-এর প্রতি যত্ন খুবই করা হয়, পুরাতন কাশীর গলিগুলিকে সাফ্ রাখিবার জন্যও তেমন কোনও চেষ্টা হয় না।

কাশীর ঘাটগুলি ভারতের মধ্য-যুগের বাস্তু-শিল্পের এক অবিনশ্বর কীর্তি, আধুনিক ভারতের—খালি আধুনিক ভারতের কেন, জগতের মধ্যে অন্যতম—অত্যাশ্চর্য দ্রষ্টব্য বস্তু এই ঘাটগুলি। ইহা কেবল ভারতবাসীরই সম্পৎ নহে, ইহা বিশ্বমানবের সাধারণ-ভাবে উপভোগ্য, প্রাচীন জগৎ হইতে প্রাপ্ত একটী রিক্‌থ। প্রতি বৎসর লক্ষ-লক্ষ ভারত-সন্তান কাশীর ঘাট দেখিয়া ধন্য হইয়া যান—সহস্র-সহস্র বিদেশীও কাশীর ঘাটের শোভা দেখিতে আইসেন, এবং ফোটোগ্রাফের কামেরার বা তুলির আঁচড়ের সাহায্যে ঘাটের সৌন্দর্যের কণামাত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে এবং তাহাদের দর্শন জনিত আনন্দকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের এখনকার হিন্দু জীবন ও হিন্দু সভ্যতা বিদ্যমান, তথাপি এই জীবনেরই একটা বড় অংশ-স্বরূপ কাশীর ঘাট, সাধারণতঃ বিরুদ্ধ-ভাবে অনুপ্রাণিত বিদেশীরও

মন হরণ করিয়া থাকে। এই ঘাটগুলি National Monument বা ভারতের জাতীয় বাস্তুসম্পৎ-স্বরূপ ভারত সরকার হইতে উপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়া সংরক্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু হায়, তাহা হইবার নহে। সরকারের এ বিষয়ে মন দিবার সময় বা ইচ্ছা নাই। কাশীর লোকেরাও উদাসীন, অথবা এ সম্বন্ধে কিছু করিবার উপযুক্ত জ্ঞান ও অর্থবল উভয়ই তাহাদের নাই। অথচ কাশীর ঘাটের সম্বন্ধে মাঝে এক ভীতিপ্রদ কথা শুনা গিয়াছিল; ঘাটগুলি যে উন্নত ভূখণ্ডে অবস্থিত, উত্তর-বাহিনী গঙ্গার চাপে নাকি সেই ভূখণ্ড অনতিদূর ভবিষ্যতে ধ্বসিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে, কাশীর ঘাটগুলি গঙ্গা-গর্ভে বিলীন হইয়া অতীতের বস্তু হইয়া যাইবে। এই বিপৎপাত হইতে ঘাট-গুলিকে যে করিয়াই-হউক বাঁচানো আবশ্যক। নদীর জল অন্য পথে চালাইয়া, উত্তর মুখে কাশীর অপর পারের কোল দিয়া বহাইতে পারা যায়, কিন্তু তাহা হইলে ঘাটগুলির সাম্‌নে আর জল থাকিবে না, কাশীর ঘাট কেবল সিঁড়ির কঙ্কালে পর্যবসিত হইবে—বৃন্দাবনের ঘাট হইতে যমুনা সরিয়া যাওয়ায় বৃন্দাবনের যে দুর্দশা হইয়াছে কাশীরও সেই দুর্দশা হইবে। গঙ্গার জল যাহাতে এখনকার মত ঘাটের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, অথচ তাহার গতিবেগে যে ভূভাগের উপরে ঘাটগুলি অবস্থিত সেই ভূভাগও বিপন্ন না হয়, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কাশীর মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে একটু চিন্তিত হইয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-নাথ দে প্রমুখ পূর্ত বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মতও লইয়াছিলেন—কিন্তু শেষে কি ব্যবস্থা ইঁহারা করিলেন তাহা জানিতে পারি নাই। সমবেত-ভাবে সমগ্র হিন্দুজাতির চিন্তা ও পরামর্শের, এবং রক্ষার জন্য উপায় নির্ধারণের ব্যাপার এইটী।

যাঁহারা কাশীর মাহাত্ম্য ও মাধুর্যের কণা-মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কাশীর মত নগর মানুষের চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত ও সমাহিত করিতে কতদূর পর্যন্ত সমর্থ হয়। বাস্তবিক, একটী নগরী, মানব-জীবনের পক্ষে কত বড় একটা আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রভাবের আকর-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা বার-বার কাশী দেখিয়া, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বলিতে পারি। রোম, যেরূশালেম প্রভৃতি সুপ্রাচীন ধর্মক্ষেত্র সমগ্র জাতিকে জাতির জীবনে কিরূপ অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা ইউরোপের ইতিহাস হইতে, য়িহুদী জাতির ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। একটী প্রাচীন দেবক্ষেত্রে বা ধর্মক্ষেত্রে, মন্দিরের অবস্থানে ও ভক্তদের সমাগমে যে ভাব-প্রবাহ বিদ্যমান, মনে হয় যেন তাহার সহিত অদৃশ্য জগতেরও যোগ আছে। একটী বিরাট্ দেবমন্দির, বিরাট্ অরণ্যানী, দিক্চক্রবাল-বেষ্টিত মহাসাগর, অথবা আকাশ-চুম্বী পর্বতের ন্যায়ই মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে। অন্য প্রকারের শিল্পের মত বাস্তু-শিল্পের বিরাট্ সৃষ্টির যে একটা আধ্যাত্মিক বাণী আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। মদুরার বা শ্রীরঙ্গম্-এর সুবৃহৎ মন্দির, বা মিলান-এর সুবিশাল গির্জা, অথবা ফ্রান্সের কোনও গথিক গির্জার সহিত শিশুকাল হইতে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করাকে জীবনের একটী কাম্য সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করা যায়। এই সকল বিরাট হর্ম্য, সু-উচ্চ স্তম্ভাবলী, প্রশস্ত অলিন্দ, সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাবের ভাস্কর্য প্রভৃতি সমস্ত মিলাইয়া যেন ঈশ্বরারাধনার ঐক্যতান সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এগুলির মধ্যে বিচরণ করিয়া, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবহমান অমৃতধারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে পান করা বা সেই অমৃত-ধারায় স্নান করা, জীবনে নিরতিশয় দুর্লভ বস্তু; বই না পড়িয়া, জীবনের সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ বস্তু-সমূহ

দেখিয়া যে শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, এইরূপ কোন নগরের আব-হাওয়ার মধ্যে শিশুকাল হইতে পরিবর্ধিত হওয়া। সমগ্র কাশী নগরী যেন একটী বিরাট মন্দির—কাশীর ঘাটগুলি, কাশীর গলি-গুলি, কাশীর প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত মন্দির, যেন একটী অখণ্ড দেবায়-তনেরই বিভিন্ন অংশ। সর্বোপরি, কাশীতে বিশ্বপিতার ও বিশ্বমাতার যে প্রকাশের আবাহন ও আরাধনা অহরহঃ চলিতেছে, শিব-উমা-ময় সেই প্রকাশ অপেক্ষা ঐশী শক্তির গভীরতর ও ব্যাপকতর কল্পনা আর কোথাও হয় নাই। হিন্দু দর্শন ও চিন্তার এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম প্রতীক—শিব ও উমা, এবং বিষ্ণু ও শ্রী। জ্ঞানময় ঈশ্বর ও প্রেমময় ঈশ্বর—শিব ও বিষ্ণু—এই দুই মহনীয় মূর্তির পাদপীঠের নিকটে আর কোন্ দেব-কল্পনা পঁহুছিতে পারে? সর্বজাতির ও সর্ব-ধর্মের সমন্বয় এই দুই প্রতীকের মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষের প্রকৃতি ও শিক্ষা এবং রুচি ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে এই দুই ভাবের মধ্যে অন্যতর ভাবটী মানুষকে অভিভূত করে। আমাদের কাশী-নগরী এই শিবেরই মহিমা দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দিকে শিবের লিঙ্গময় মূর্তি বিরাজমান; পথ-ঘাট মন্দির-প্রাঙ্গণ সমস্তই শিবের নামে মুখরিত—'হর হর বম্ বম্', 'শিব শিব শম্ভো', 'মহাদেব মহাদেব', দেবতার জন্য এই সব আহ্বান-বাণী, কাশীতেই যেন এক বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। ঊর্ধ্বে শরতের সন্ধ্যা-গগন যখন ধূসর-বর্ণ, কোয়াসার মধ্যে দুই একটী নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, এবং নিম্নে গঙ্গার সলিল, ঘাটের পাথরের গায়ে লাগিয়া 'ছলচ্ছল্-টলটল্-কলকল্ তরঙ্গে' চলিয়াছে; ঘাটের পাথরের উপরে, কিংবা জলের উপরে কাঠের পাটাতনে বসিয়া, সন্ধ্যা-বন্দনায় তন্ময় বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মুখে ভক্তি-ভাবের অপূর্ব প্রকাশ; ওদিকে রাত্রির আরতির জন্য নাট্টুকোটা-চেট্টীদের সত্র

হইতে সন্ন্যাসীরা, 'শম্ভো শিব শিব' রবে ভক্তের প্রাণে অপূর্ব উন্মাদনা ও আকুলতা আনিয়া, রাজমার্গ দিয়া পূজার রৌপ্যময় তৈজস-পাত্র ও গঙ্গাজল ও দুগ্ধাদি উপকরণ লইয়া যাইতেছে; কেদার-ঘাটে তামিল ভক্ত বসিয়া, মাণিক্ক-বাশগর্-এর মধুস্রবী স্তোত্র গাহিয়া যাইতেছে—ভাষা না বুঝিলেও, সেই স্তোত্রের ধ্বনির ঝঙ্কার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রাণের মধ্যে এক আলোড়ন আনিয়া দেয়, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়; নির্জন প্রাসাদের পদ-তলে গঙ্গার উপরে চবুতরায় মৃগ-চর্মের উপর বসিয়া সন্ন্যাসী শ্রুতি-সুখকর স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠে শিবমহিম্ন স্তোত্রের শিখরিণী ও মালিনী ছন্দোময় সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে; এবং শেষ—বিশ্বেশ্বর মন্দিরের শয়নারাত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি ও পুরোহিতের সমবেত কণ্ঠে স্তবপাঠ;—এইরূপ মানব কণ্ঠোত্থিত সমস্ত আবেদন ও অর্চনা, যেন বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত, মানব-ভাষাতীত বাণীর সহিত মিলিত হইয়া—অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে সমীক্ষা, কল্পনা ও অনুভূতির সাহায্যে, জ্ঞাত ও পরিচিত এবং কচিৎ বা উপলব্ধ করিয়া লইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে। মানুষ নিজের অবস্থান-ভূমির পারিপার্শ্বিককে দেবশক্তির পদচ্ছায়াতলে আনিয়া কত সুন্দর ও শোভন করিতে পারে; জীবনের দৈনন্দিন কর্মের পটভূমিকা-স্বরূপ ঈশ্বরের সত্তা যে সদা-জাগ্রত—কাশীর ন্যায় ধর্ম-নগরী ও কলা-নগরী অহর্নিশ তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষ করাইতেছে, সেই বাণী অহর্নিশ আমাদের কর্ণের গোচরে আনিতেছে। আমাদের এই উদ্দেশ্য-হীন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট কর্ম-ব্যস্ত জীবনের মধ্যে শাশ্বতের এই আবাহন একটী পরম বরণীয় বস্তু; (কয়লার খনির খাদের ভিতরে আমরা দিনপাত করিতেছি, কাশীর ন্যায় নগর সেখানে মাঝে-মাঝে মহাসাগরের হাওয়া বহাইয়া দেয়, সেখানে রৌদ্র-দীপ্ত আকাশ ও হরিদ্বর্ণ শষ্পের শোভা, এবং ঝরণার সঙ্গীত ও পাখীর গান আনিয়া দেয়॥)

আমাদের সামাজিক "প্রগতি"

তিন পুরুষ ধরিয়া কলিকাতায় আমাদের বাস, জীবনের চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রায় সমস্ত কলিকাতাতেই অর্জিত। এখানকার মধ্যবিত্ত সমাজ ছেলেবেলায় যেমন দেখিয়াছি, এখন আর সে-রকমটী নাই। পরিবর্তন যাহা ঘটিতেছে, তাহা আগে একটু মন্থর গতিতেই ঘটিতেছিল, কিন্তু বিগত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্তনটা একটু দ্রুত গতিতে, একটু বিশেষ "উচ্চৈঃস্বরে" হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সামাজিক গতি এখন আর যেন স্বাভাবিক, সামঞ্জস্যময়, "গতি"-পদ-বাচ্য নহে, ইহা এখন "প্রগতি" হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার মধ্যে একটা অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব আছে; নিজের খেয়ালে ও আবশ্যকতা অনুসারে না চলিয়া, সমাজ যেন এখন বাহির হইতে চাবুক খাইয়া ছুটিতে চাহিতেছে, দিশাহারা হইয়া কেবল উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে পারিলেই যেন বাঁচে। কোনও-কোনও বিষয়ে কালোপযোগী পরিবর্তন ও উন্নতি অবশ্য আসিতেছে; কিন্তু মোটের উপরে আমার মনে হইতেছে যে, যে-পথে আমাদের সামাজিক জীবন ধাবিত হইতেছে, সে পথ জাতীয় সমাজ ও জাতীয় চর্যার পক্ষে সুষ্ঠু পথ নহে, সে পথে চলিয়া শেষটা আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই।

দুই-একটা বিষয় লইয়া অবস্থাটী আলোচনা করা যাক্। নিমন্ত্রণ করিয়া লোক খাওয়ানো একটা বড় সামাজিক ব্যাপার। এই লোক খাওয়ানো আমাদের দেশে দুই রকমের হয়; ইউরোপে—যতদূর আমার অভিজ্ঞতা—এই দুই রকমের হয় না, অন্ততঃ ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজে হয় না। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আমাদের "সামাজিক"

ব্যাপারে আত্মীয়-কুটুম্ব, স্বজাতীয়, পরিচিত ব্যক্তি, বন্ধু, অল্প-পরিচিত ব্যক্তি, ইহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এই নিমন্ত্রণে, সাধারণ সঙ্গতিযুক্ত গৃহস্থ কাহাকেও বাদ দিতে পারেন না। মাঝারী শ্রেণীর গৃহস্থ-বাড়ীতে চার-পাঁচ শত লোকের পাতা পড়া অতি সাধারণ ব্যাপার। এই প্রকারের নিমন্ত্রণে কলিকাতা অঞ্চলে লুচী খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় প্রকারের নিমন্ত্রণ—ঠিক "সামাজিক" বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ইহা সে শ্রেণীর নহে। ইহা বন্ধু-খাওয়ানো—ইহাতে দুই-দশ জন কিংবা বিশ-পঞ্চাশ জন অন্তরঙ্গ বন্ধু অথবা আত্মীয়-কুটুম্বকে ভাল করিয়া খাওয়ানো হয়। সমাজ-প্রগতি আলোচনায় এ জিনিস ধর্তব্যের মধ্যে নহে। ইউরোপে সামাজিক ভোজ বলিলে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুসম্মিলনী মুখ্যতঃ বুঝায়। বিলাতে অবস্থানকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক ইংরেজ বন্ধুর নিকট কোনও একটী বিবাহের ঘটার কথা শুনিতেছিলাম। বন্ধুটী সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "এই বিবাহ উপলক্ষে একটী 'লাঞ্চ' বা মধ্যাহ্ন-ভোজ দেওয়া হয়, এবং তাহাতে চল্লিশ জন লোককে খাওয়ানো হইয়াছিল (Quite a swell affair—forty covers were laid for the luncheon)"। আমাদের সাধারণ ভদ্রগৃহে তিন-চারি শত লোক খাওয়ানো যে অতি সাধারণ ব্যাপার তাহা ইহারা কল্পনাই করিতে পারিত না। আমাদের দেশে ইহা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, পূর্ব-কালে যখন এই রীতি বা রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমাজে বিশেষ কোন চাল বা ভোগের আতিশয্য ছিল না, লোকে সাদা-সিধা ভাবে জীবন যাপন করিত, এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে আত্মীয়-কুটুম্ব, স্বজাতীয় স্বগ্রামবাসী, মিত্র এবং পরিচিতগণের সম্মেলনই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—অবশ্য ভোজনটাও অন্যতর

বড় উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ সমবেত সামাজিক উৎসবে গ্রামের লোক পরস্পরের সহায় হইত। তখন খাদ্যদ্রব্যও ছিল সুলভ, এবং সামান্য বস্তুতেই লোকের সন্তোষও হইত। একশ' বছর হইতে চলিল, "কুলীন-কুলসর্বস্ব" নাটকে ঔদরিক ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকারের ফলারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তখনকার দিনের উত্তম ফলারের বর্ণনা শুনিয়া, আজকালকার "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোকের রসনা সিক্ত হওয়া অপেক্ষা নাসিকাই কুঞ্চিত হইবে—"ঘিয়ে-ভাজা তপ্ত লুচি, দু-চারি আদার কুচি, কচুরি তাহাতে খান দুই। ছক্কা আর শাক-ভাজা, মোতিচুর বঁদে খাজা, ফলারের যোগাড় বড়ই॥"—একথা আজকালকার কুড়ি টাকা মাহিনার কেরাণীও শুনিয়া হাসিবে; এবং মধ্যম ফলারের—"সরু চিঁড়া, কাতারি কাটিয়া শুখা দই, মর্তমান কলা এবং ফাকা খই," ও অধম ফলারের—"গুমা চিড়া, জ'লো দই, চিটা গুড় ধেনো খই" প্রভৃতির উল্লেখ তো আজকাল ভদ্র সমাজে করাই চলিবে না। অর্থাৎ এই একশত বৎসরে, বাঙ্গালার ভদ্র-সমাজের পয়সা কমিয়াছে, সামাজিক ঐক্যবোধ কমিয়াছে, সামাজিক ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহায়তার ভাবও কমিয়াছে; এই একশত বৎসরে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য, এবং বিশুদ্ধ খাদ্য প্রায় অপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে; ঘরে ঘরে এখন দু'বেলা দু'মুঠি অন্নের জন্য হাহাকার; কিন্তু বাড়িয়াছে আমাদের চাল, বাড়িয়াছে পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতার ভাব, বাড়িয়াছে বিরাট্ কিছু একটা ব্যাপার করিয়া, সমাজের সকলের মনে তাক লাগাইয়া দিবার ইচ্ছা।

আমার বেশ মনে আছে, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে যখন আমার বয়স দশ-এগার বৎসর হইবে, কোন বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেখানে আহার্যের সাধারণ নিরামিষ পদের উপর অধিকন্তু মাছের

কালিয়া হইয়াছিল, এবং এই অভিনব ব্যাপার লইয়া অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রকারেরই একটা চাপা আলোচনা পড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের প্রায় ২০ বৎসর পরে, আর-একটী বিবাহের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হই, বরযাত্রী-হিসাবে। সেদিন "লগনসার বাজার" ছিল, এবং কলিকাতাবাসী সকলেই জানেন, ঐরূপ দিনে কলিকাতায় মাছ, দই, সন্দেশ কিরূপ দুর্মূল্য হইয়া পড়ে; এবং দই সন্দেশ বেশী মূল্য দিয়া পাওয়া গেলেও, মাছ সময়-সময় দুষ্প্রাপ্য হয়, কখনও-কখন একেবারে অপ্রাপ্যই হইয়া যায়। যে বিবাহের কথা বলিতেছি, তাহাতে কন্যাকর্তা সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, কলিকাতায় নবাগত বলিয়া মাছের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। বরপক্ষ তাঁহারই নিজের জেলার। বরের কতকগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কতকগুলি স্বগ্রামবাসী আত্মীয়-কুটুম্ব যুবক খাইতে বসিয়া মাছ না পাইয়া এমনি অধৈর্য হইলেন যে, তাঁহাদের অধৈর্য্য-ভাব ও অসন্তোষ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না,—এবং বিপন্ন কন্যাকর্তা আসিয়া ভোজন-নিরত "গয়ার পাপ" এই সকল বরযাত্রীর নিকট করযোড়ে নিজ ত্রুটী স্বীকার করা সত্ত্বেও অনেকে হাত গুটাইয়া রহিলেন—আর খাইলেন না, এবং কেহ-কেহ গ্লাসের জলে আচমন সারিয়া লইয়া, রুমালে হাত মুছিয়া সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। বিবাহের ভোজে মাছের ব্যবস্থা না হওয়ায়, অনেক স্থলে, "একি শ্রাদ্ধ বাড়ীতে খেতে এসেছি" বলিয়া রূঢ়তা প্রকাশ করার কথাও শুনিয়াছি।

আরও দশ বৎসর পরে, আজকালকার দিনে একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই সব সাধারণ নিমন্ত্রণ-উৎসবেও লুচি ও মাছের কালিয়ার অতিরিক্ত পোলাও ও মাংসের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন, এবং কেহ-কেহ এই চালের সহিত ব্যয়-সংক্ষেপের সামঞ্জস্য করিবার জন্য, পাইকারী হিসাবে

ছাগল কিনিয়া আপনার ঘরে দুই একদিন রাখিয়া, সেইগুলিকে যথাদিনে বধ করান—বিবাহাদি উৎসবের আয়োজনের মধ্যে একটী ছোট-খাট কসাইখানা বসাইতেও দ্বিধাবোধ করেন না—যদিও এই কসাইখানা বাড়ী হইতে একটু দূরে করা হয়।—ভারতীয় এবং হিন্দু সংস্কৃতির দৃষ্টিতে দেখিতে, এইসব ব্যাপার সাধারণ ভদ্রতা-বিগর্হিত বর্বরতা এবং ঔচিত্যবোধ-রহিত হৃদয়হীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কলিকাতার কোনও সম্ভ্রান্ত ও দেশবরেণ্য পরিবারের কথা বলিতেছি; এই পরিবারের যশ কেবল বাঙ্গালা দেশে বা ভারতবর্ষে নিবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের শিক্ষিত লোকের কাছে এই পরিবারের নাম পঁহুছিয়াছে—একবার ইঁহাদের বাড়ীতে কোন কন্যা-বিবাহের নিমন্ত্রণের ভোজে মাছ-মাংসের সংস্পর্শও দেখিলাম না। জিনিসটী এমনই অভাবনীয় লাগিল যে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—বিবাহের ন্যায় শুভ-উৎসবে জীব-হত্যার রীতি ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই কথা শুনিয়া আমার অবশ্য বিশেষই আনন্দ হইয়াছিল, এবং সমাগত বন্ধুদের যাঁহারা ইহা শুনিলেন, তাঁহারাও এইরূপ মনোভাবের শ্রেষ্ঠতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন।

সামাজিক নিমন্ত্রণের ভোজনের পদের সংখ্যা এইরূপে ক্রমাগত বাড়িয়া চলা বাঙ্গালী সমাজের ক্রমপ্রবর্ধমান মূর্খতা ও বর্বরতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যাপার এইরূপই দাঁড়াইয়াছে যে, কোন-কোন স্থলে ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিতেছে—কেবল ভদ্রতা কেন, শালীনতাবোধ এবং কাণ্ডাকাণ্ড-বোধেরও মাত্রাকে অতিক্রম করিতেছে। কলিকাতা-অঞ্চলে বিবাহের আশীর্বাদের নিমন্ত্রণের খাওয়া ("পাকা দেখায় খাওয়া") সাধারণতঃ অর্থশূন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে—চল্লিশ-পঞ্চাশ বা ষাট-সত্তর রকমের পদ তৈয়ারী

করিয়া নিমন্ত্রিতের পাতে দিয়া নষ্ট করিতে না পারিলে, একটু সম্পন্ন গৃহস্থ যেন স্বস্তি লাভ করেন না।

এইসব ব্যাপার যে ঘটিতেছে, তাহার প্রধান কারণ—আমাদের সমাজের মধ্য হইতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ-শক্তি যেন আর থাকিতেছে না। নবাগত কাঞ্চন-কৌলিন্যের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের বাঁধন খুলিয়া যাইতেছে। বাঁধনের দোষ অনেক আছে, কিন্তু বাঁধন না হইলে আবার একতাও হয় না, বাঁধন না থাকিলে ব্যষ্টি সমষ্টিতে পরিণত হইয়া, কার্য-সাধিকা সংহতিতে দাঁড়ায় না। বাঙ্গালার বাহিরে যে সমস্ত হিন্দু সমাজ আছে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন এখনও অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে বিদ্যমান, এবং সেই সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতা-বোধও যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত আছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে সামাজিক ভোজে যদি একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম করা যায় যে, এই অনুপাতে এই প্রকারের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত করিলে সমাজের প্রতি অত্যাচার করা হইবে এবং তাহা নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা বাঁচিয়া যাই।

আমাদের সাধারণ জাতীয়তা-বোধ এখন কমিয়া আসিতেছে—অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে উদ্ভূত রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, চাল-চলন আর পূর্ববৎ প্রবল থাকিতেছে না। সমাজ চলে নিজের বিপুল দেহভারের স্বাভাবিক গতিতে; কিন্তু দুই-চারিজন সমাজনেতা বা "ফ্যাশন-বাজ," অনেক সময়ে সমাজের এই ধীর-মন্থর গতিকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। "একটা নূতন কিছু করো" এইভাবে প্রণোদিত প্রতিপত্তিশালী কোনও ব্যক্তি, যেখানে নিজের বিচার ও রুচি অনুসারে নূতন কিছু রীতি প্রবর্তিত করান, সমাজের আর দশজন

সেই রীতিতে অস্বস্তি অনুভব করিলেও চুপ করিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ মানিয়া লয়—প্রতিবাদের সাহস অনেকের থাকে না, কারণ, তাহা হইলে লোকে প্রতিবাদ-কারীর শিক্ষা এবং মানসিক প্রগতির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবে, হয় তো বা তাহাকে অন্ধ প্রাচীন সংস্কারের দাস-ই বলিয়া ফেলিবে, এবং তাহাতে তাহার মনে অপমান-বোধ হইবে। কলিকাতার সমাজ এখন বহুল পরিমাণে পল্লী-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন। আমাদের সামাজিক চাল-চলন বা আদব-কায়দা—ইংরেজীতে যাহাকে বলে "এটিকেট্"—সে সম্বন্ধে এই বছর দশ-পনেরর মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। আমরা স্বদেশীয়ানার দোহাই দিয়া যতই তারস্বরে চেঁচাই না কেন; দৈন্যের নিপীড়নে দেড়-টাকার খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং পাঁচ-সিকার চাপ্লি জুতা পরিয়া Plain Living and High Thinking-এর দোহাই যতই পাড়ি না কেন; আমাদের বিজ্ঞাপনের ছবিতে ভারতীয়ত্বের নিশানা-স্বরূপ নকল অজণ্টার ছাপ যতই মারি না কেন;—ইহা অতি সত্য কথা যে, আমরা ইউরোপীয় আদব-কাযদা ও রীতি-নীতি শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া, স্বাভাবিক-ভাবে সহজেই গ্রহণ করিতেছি। এখানে "রীতি-নীতি" শব্দ দ্বারা আমি দেশ-কাল-নিবদ্ধ চলা-বসার কায়দা-কানুন-ই ধরিতেছি —মানসিক উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ের কথা ধরিতেছি না। গাছ-তলায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া, ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ মনীষার সহিত টক্কর দিতে পারে, এইরূপটীও দেশে দেখিয়াছি; আবার খুব কেতা-দুরুস্ত ইংরেজী-ফ্যাশন-বিদ্ ব্যক্তি, মানসিক উৎকর্ষ বিষয়ে অশিক্ষিত-পদবাচ্য, এরূপটীও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুসারে, যেরূপ রীতি-নীতি, আদব-কায়দা হওয়া স্বাভাবিক, তাহা ক্রমে-ক্রমে গঠিত হইয়াছিল। এখন আমরা সেগুলিকে

ছাড়িতেছি, সেগুলির সহিত পরিচয়ের অভাব হেতু, এবং ইউরোপীয় রীতি-নীতির সহিত পরিচয় ও তাহার অনুচিকীর্ষা হেতু। কলিকাতায় পাঁচ বাড়ীর ভদ্র শিক্ষিত লোক একত্র হইলেই, আমাদের আদব-কায়দা অনেকটা ইংরেজী আদব-কায়দার এক নিকৃষ্ট অনুকরণ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের বৈঠকখানা এখন ড্রয়িঙ্-রুম্-এ পরিবর্তিত হইতেছে—ইহা বলিলেই এক কথায় অবস্থার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি ঘটিবে। ড্রয়িঙ্-রুমে পরিবর্তিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু বৈঠকখানার বিকাশ যদি সময়-উপযোগী হইয়া ঘটিত, বৈঠকখানাকে ঘুচাইয়া দিয়া ড্রয়িঙ্-রুম যদি আসিয়া না বসিত, তাহা হইলে জাতির "কাল্‌চার" বা চর্যার ধারার সহিত একটা যোগ থাকিত। অন্তঃপুরেও এই ভাব প্রবেশ করিতেছে। সে দিন কোনও বন্ধু, একটী সান্ধ্য-সম্মেলনের বন্দোবস্ত করিবার কালে আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিলেন—"হ্যাঁ মহাশয়, আজকের সন্ধ্যার পার্টির চীফ গেস্টকে যদি মালার সঙ্গে চন্দন দেওয়া যায়, তা হ'লে সেটা কি 'ওরীয়্যাণ্টাল' হবে?" হিন্দুর ছেলে আমার কাছে দৌড়িয়া আসিয়াছে ফতোয়া লইবার জন্য—সান্ধ্য-সম্মেলনে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের কপালে চন্দন দিলে, "ওরীয়্যাণ্টাল" হইবে কিনা। অর্থাৎ আমাদের কাছে সাবেক ধরণ-ধারণ সমস্ত এখন যেন কোন্ সুদূর "ওরীয়্যাণ্টাল" হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমাদের নিজের দেশের-ই রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ঠিক যেন ইউরোপিয়ানের মনের ভাবের অনুকারক হইয়া পড়িতেছে—নাড়ীর টান আমরা হারাইতেছি। এই নূতন "কাল্‌চার"-এর চোখ, ইউরোপিয়ানের চোখ আমরা পাইতেছি; ওদিকে মানসিক ফিরিঙ্গীয়ানা যত বাড়িতেছে, নিজেদের সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্থিতির প্রতি, জাতীয় মনোভাবের প্রতি, যতই আস্থা ও শ্রদ্ধা

আমাদের কমিতেছে, যতই আমরা সুবিধাবাদী হইয়া পড়িতেছি, ততই আমরা আমাদেব জীবনের একটু বাহ্য decoration বা অলঙ্কৃতি-রূপে দুই-একটা সেকেলে জিনিস রাখিয়া, "ওরীয়্যাণ্টাল", "ওরীয়্যাণ্টাল" বলিয়া চেঁচাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভেব চেষ্টা কবিতেছি।

নিমন্ত্রণের ভোজের কথা লইযা আবম্ভ করিয়াছিলাম—সেই সম্পর্কে আব একটা পরিবর্তনেব উল্লেখ করিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের শেষ কবিব। আজকাল কলিকাতায় হিন্দু ভদ্র গৃহে সামাজিক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে টেবিলে খাওযানোর রীতি প্রচলিত হইতেছে। শুচিবায়ুগ্রস্তা অথবা শুচিব্রতা আমাদেব পিতামহীগণ স্বর্গে থাকিয়া আজকালকার হিন্দু সমাজের অনাচার দেখিয়া নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিতেছেন; কিন্তু কালধর্মে, সডকী বা উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে সেকেলে নিষ্ঠাবান্ বাঙ্গালী হিন্দুব ধাবণা আর বজায় থাকিতেছে না। টেবিলে খাওয়া প্রচলিত হওয়া কতকটা এই অত্যধিক শুচিতাবোধ অথবা শুচিবায়ুব বিরুদ্ধে একটা অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া। নিমন্ত্রণ-সভায় জুতা চুরি যাইবার ভয় আছে; জুতা চোখের সামনে বাখিয়া, বা পরিয়া খাইতে বসায়, মনে একটা স্বচ্ছন্দতা আসে, এইজন্য টেবিলে বসিয়া খাওয়ার এতটা লোকপ্রিয়তা ঘটিতেছে। সমাজের মধ্যে যে কিরূপ ট্রাজি-কমিক ব্যাপার বিদ্যমান, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। ইহাব উপবে হোটেলগুলিরও প্রভাব আছে। এই সকল মিলিয়া, সামাজিক ভোজেও টেবিলে বসিয়া খাওয়ার রীতি প্রবর্তনেব সহায়তা করিতেছে। কিন্তু ইহাতে এখনও সাধাবণ বাঙ্গালী সমাজিক-ভাবে অনেকে একত্রে বসিয়া খাওয়াব কালে, স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে না। পূরা ইউবোপীয মতে টেবিলে বসিয়া খাওয়া আমাদের পক্ষে শিক্ষা-সাপেক্ষ ব্যাপাব, বিশেষ ব্যয়-সাধ্য তো বটেই। খাইতে-খাইতে-পাঁচবার দেহ বাঁকাইয়া অষ্টাবক্র হইয়া,

ধুতি, জামা, চাদর বাঁচাইয়া বসা খুব প্রীতিকর ব্যাপার নহে—জুতা বাঁচিল বটে, কিন্তু টেবিলের উপরে রক্ষিত কদলীপত্র বা অন্য পাত্র হইতে, অথবা পরিবেশকের হাতা হইতে নিপতিত তরকারীর ঝোল বা পানিতোয়ার রস গায়ে যাহাতে না পড়ে, সে বিষয়ে নজর রাখিতে-রাখিতেই যেন প্রাণ যায়। কুশাসনের ভাড়া এবং কলাপাতা কেনার যে খরচ, চেয়ার-টেবিলের ভাডা এবং অন্য খরচ তাহা অপেক্ষা কম নহে,—কিন্তু কর্মভোগও অনেক ; এবং সকলেই যে ইহা পছন্দ করে তাহাও নয়। আবার কলাপাতার বদলে টেবিলে পাতিবার জাপানী কাগজের জন্য কিছু পয়সা আমরা বিদেশে দিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে "বাবু-ভাইয়া"দের মধ্যে একটা ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, এই টেবিলে খাওয়ানোটাই smart এবং fashionable ; আর কি রক্ষা আছে ? শত অসুবিধার কথাও ইহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়। প্রথম-প্রথম টেবিলে খাওয়ার রীতি প্রবর্তিত হওয়ার সময়ে, এরূপ খাওয়াকে কোথাও-কোথাও "দাঁড়া খাওয়া" বলিতে শুনিয়াছি ; তখন কেহ-কেহ ইহাতে আপত্তিও করিতেন। এইরূপ "দাঁড়া-খাওয়া"-তে যোগ না দিয়া, আমিও এক-আধ বার আমার জাতীয়তা-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম ; কিন্তু ফ্যাশন-এর স্রোত দুর্নিবার। কোনও নিমন্ত্রণে গিয়া পংক্তিতে বসিয়া, কলাপাতায় করিয়া খাইতে গেলে বিশেষ দেরী হইবে, অতএব টেবিলে-ই বসিয়া যাও, এই অনুরোধের উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা দ্বারাই আমার এবং আমার ন্যায় জাতীয় চর্যা-বিষয়ে রক্ষণশীল বহু হিন্দু-সন্তানের মনোভাব বুঝা যাইবে—"হিন্দুর মধ্যে খাওয়া-দাওয়ায় আমরা জা'ত মানি না ; কিন্তু পাত মানি ॥"

ভিক্ষুক

বছর তিনেক পূর্বে দক্ষিণ-দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। ৺পূজার ছুটীতে দুইজন বন্ধুর সহিত কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ রওনা হই। পথে কোকনাডা ("কাকনাড") হইয়া মাদ্রাজ পহুঁছাই। মাদ্রাজে একটী গুজরাটী শেঠের স্থাপিত ধর্মশালায় আমরা কয়দিন কাটাই, মাদ্রাজের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়া লই। তার পরে আমরা আরও দক্ষিণে, দ্রাবিড় বা তামিল দেশের বড়-বড় তীর্থ যে কয়টী রেলের লাইনে পড়ে, সেই কয়টী দেখিতে বাহির হই। কতক পথ মোটর-বাসে করিয়া যাই, কিন্তু আমাদের ভ্রমণ বেশীর ভাগই রেলে হয়। তৃতীয় শ্রেণীতেই সর্বত্র গিয়াছি —নানা কারণে কোনও অসুবিধা অনুভব করি নাই, তৃতীয় শ্রেণীতেও যাত্রীর অভাব ছিল; রাত্রে ঘুমাইয়া যাইবার ব্যাঘাতও ঘটে নাই। এইরূপে প্রায় মাসখানেক ধরিয়া কাঞ্চীপুর, পক্ষিতীর্থ, মহাবলিপুর, পণ্ডিচেরী, চিদম্বরম্, তাঞ্জোর, কুম্ভকোণম্, ত্রিচিনোপল্লি, মদুরা, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, ত্রিবন্দ্রম্, কন্যাকুমারী, এর্ণকুলম্, ত্রিচূড় ও উটাকামণ্ড্—এই স্থানগুলি দেখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

বাঙ্গালা দেশ হইতে আমরা সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিমেরই টান অনুভব করিয়া থাকি, উত্তর-ভারত তাহার সমগ্র প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি লইয়া চিরকাল ধরিয়া আমাদের আকর্ষণ করিয়া থাকে। উত্তর-ভারতের যত তীর্থ, যত প্রাচীন নগরী, রাজপুত ও মুসলমান যুগের যত কীর্তি-কলাপ—এগুলির সঙ্গে আমরা যেন এক অচ্ছেদ্য যোগ অনুভব করি।

গয়া, কাশী, অযোধ্যা, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন; লখ্‌নৌ, আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর; আবার হিমালয়ের পাদদেশে ও ক্রোড়মধ্যে হরিদ্বার, লছমনঝোলা, কেদার-বদরী, পশুপতিনাথ, অমরনাথ। পাঞ্জাব ও রাজপুতানা, নেপাল ও কাশ্মীর, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র—এগুলি তো উত্তর-পশ্চিম ভারতেরই অনুবৃত্তি। বাঙ্গালী যেন ঐ সব দেশে যাইবার জন্য মুখাইয়া থাকে; শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা নির্ধন, সব শ্রেণীর বাঙ্গালীর কাছে তীর্থ বা ভ্রমণ এই দুই উপলক্ষ্য লইয়া পশ্চিমের আহ্বান সর্বদা আসিতেছে, বাঙ্গালীও যথাশক্তি তাহার সাড়া দিতেছে। কিন্তু দক্ষিণ-দেশ, তাহার বিপুল ঐতিহাসিক সম্পৎ, তাহার বিরাট মন্দিরাবলী এবং দেশের লোকেদের মধ্যে বিদ্যমান দুর্লভ ভক্তি ও ভাবশুদ্ধি লইয়া বিরাজমান। আমরা যেন সেদিকে নাড়ীর টান অনুভব করি না। আমরা সাগর-দর্শন ও দেব-দর্শন ও উভয় উদ্দেশ্য লইয়া পুরীধাম পর্যন্ত যাই বটে, কিন্তু তাহার দক্ষিণে বড় একটা যাইতে চাহি না। কোনও রকমে ক্বচিৎ সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে গিয়া, একটা বড় তীর্থ দেখিয়া বা ছুঁইয়া আসিয়াছি বলিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করি; কিন্তু খুঁটি-নাটির সঙ্গে, অন্তরের আনন্দের সঙ্গে সবটা উপভোগ করিতে করিতে দক্ষিণ-দেশ দর্শন যেন আমাদের ধাতে সহে না।

আমরা তিনজন কিন্তু দক্ষিণ-দেশে অনেক কিছু পাইবার জন্য গিয়াছিলাম; দক্ষিণের ইতিহাস ও কীর্তি-কাহিনী, সাহিত্য ও শিল্প,—এগুলির সহিত আংশিক পরিচয় স্থাপন করিয়াই গিয়াছিলাম, দক্ষিণ-দেশ যেমনটী আছে তেমনটীই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম, সেই জন্য, আমাদের ভ্রমণ যতদূর সার্থক হওয়া সম্ভব ততদূর সার্থক হইয়াছিল। আমরা আমাদের ভ্রমণটী সম্পূর্ণ-রূপে উপভোগ করিয়াছিলাম। দক্ষিণের বিরাট্ প্রাণের সাড়া আমরা যেন পাইয়াছিলাম;—

কেবল দেশের বিরাট্ মন্দিরগুলির মধ্যে নহে—রাস্তার ভীড়ের মধ্যে, সভাসমিতিতে ও গানের জলসায় হোটেলে, ট্রেনে, স্টেশনে, দোকানে, হাটে, পথে ঘাটে সর্বত্র আমরা প্রাচীন ও আধুনিক দ্রাবিড় জীবনের স্পন্দন যেন কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের জীবনের সমীক্ষা ও রসোপভোগ অনেকখানি অপূর্ণ থাকিত, যদি এই ভাবে দ্রাবিড়দেশ-দর্শন আমাদের না ঘটিত। এই ক্ষুদ্র ভ্রমণটুকু সমাধা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আমাদের মনে হইল, ভারতের সনাতন আত্মার এক অতি মনোহর ও বিশিষ্ট প্রকাশ আমাদের চক্ষের সামনে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। আমাদের মনে হইল, দক্ষিণ-ভারত না দেখিয়া আসিলে আমাদের এই বিরাট্ দেশের সঙ্গে পরিচয় নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকে। দ্রাবিড়দেশে এই ভ্রমণের স্মৃতি চিরকাল আমাদিগের চিত্তে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, এই স্মৃতি আমাদের মনকে পূর্ণ ভাবশুদ্ধি দ্বারা সরস ও উন্নত করিয়া রাখিবে—এবং মাঝে-মাঝে দক্ষিণ-দেশের জন্য মনকে মোহাবিষ্ট ও আকুল করিবে।

সমস্ত ভ্রমণ-কাহিনী এখন দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিতে বসিব না। কি ভাবে আমরা চলিয়াছি ফিরিয়াছি, ভ্রমণের সুবিধা অসুবিধা কি ছিল, কি কি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কোথায় বা দক্ষিণের চিরন্তন প্রাণের পরিচয় পাইয়াছি—এসব কথা লইয়া ধারাবাহিক রূপে বলা চলে। কিন্তু সে কাজে এখন হাত দিব না। আমি আজ কেবল দক্ষিণভ্রমণ-কালে আমাদের চোখের সামনে দেশের জীবন-প্রবাহের মধ্যে পরিদৃষ্ট একটী ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলিব। তাহা হইতে এক দিক্ দিয়া দক্ষিণের প্রাণের একটু পরিচয় মিলিবে।

ট্রেনে করিয়া চিদম্বরম্ হইতে তাঞ্জোর যাইতেছি। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা, আসাম-বেঙ্গল লাইনের মত ছোট লাইন। তখন বেলা প্রায়

সাড়ে এগারোটা হইবে। গাড়ীতে ভীড় মন্দ নহে। সাধারণ লোকের ভীড়,—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, কৃষক-শ্রেণীর লোক-ই বেশী। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট স্টেশন আসিতেছে, গাড়ী দুই-চারি মিনিট থামিতেছে, লোকে নামিতেছে, উঠিতেছে। আমরা তিনজনে দুইটা জানালার ধারে বসিয়া গল্প করিতে-করিতে চলিয়াছি। সহযাত্রীরা মাঝে মাঝে কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমাদের বাঙ্গালী চেহারার প্রতি তাকায়, কেহ-কেহ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতে দুই-একটা কথা কহিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করে। হিন্দী-জানা লোক নিতান্তই বিরল। দুপুরের গরমে আমাদের যাত্রা বড়ই একঘেয়ে' ঠেকিতেছিল, আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলের আশায় টাইম-টেবল্ মিলাইয়া কেবল স্টেশন গুণিতেছি, কখন তাঞ্জোর পহুঁছিব। এমন সময়ে, মাঝে কি একটা স্টেশনে, আমাদের কামরা হইতে লোক নামিল, ও কতকগুলি নূতন লোক উঠিল। যে যাহার স্থান করিয়া লইয়া বসিল—সেই লাল ও হলুদে' রঙ্গের সাড়ী-পরা, মাথা-খোলা, গায়ে হলুদ-মাখা, নাকে নাকছাবি তামিল ব্রাহ্মণনারী; সেই লুঙ্গীর আকারে কাপড় পরা, দুহাতে সোনার বালা, মাথায় উড়ে'-খোঁপা, কানে হীরার কানফুল, খালি গায়ে জরী-পাড় চাদর ঝুলানো কৃষ্ণবর্ণ চেট্টী; সেই হাঁটু-পর্যন্ত কাপড়, খালি গা, মাথায় লাল কাপড়ের পাগড়ী, হাতে চুরুট, তামিল পল্লীবাসী। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন দেখিলাম, একটী লোক জায়গা খুঁজিয়া না লইয়া বা বসিবার চেষ্টা না করিয়া, কামরার দরজার সামনে যেখানে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে দাঁড়াইয়াই একটী বক্তৃতা জুড়িয়া দিল। লোকটির চেহারায় হঠাৎ দৃষ্টিতে লক্ষণীয় কিছু ছিল না। বেঁটে খাটো মানুষটী পরণের সাদা ধুতি, লুঙ্গীর ধরণে কাছা না দিয়া কোমরে জড়ানো, কাঁধে একখানা জরীপাড় চাদর, মাথার

অর্ধেক অংশ কামানো, দাড়ী-গোঁফ তিন-চার দিন কামানো হয় নাই, কপালে বিভূতি, দুই কানে দুইটী বড় হীরার কানফুল জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে, গলায় একগাছি সোনার হার, দুই হাতে সোনার নিরেট বালা দুগাছি, খালি পা, গায়ের রঙ্গ্‌ বেশ কালো। বড়-বড় সংস্কৃত শব্দে ভরা খুব স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধরণের তামিলে বেশ টানিয়া-টানিয়া তাহার বক্তব্য বলিয়া যাইতেছে, যেন সুর করিয়া কিছু পাঠ করিতেছে। দুই চারিটা সংস্কৃত কথা কানে লাগিল—"দানম্‌—পুণ্যকর্ম্মম্‌ (ম্‌ দিয়া শব্দটীকে তামিল করিয়া লওয়া লইয়াছে)—ঈশ্বরক্রুপৈ—দেবপূজনম্‌—ধর্মার্থকামমোট্‌শম্‌" ইত্যাদি কথা যেন কানে লাগিল। ইহার বক্তৃতা শুনিয়া ভাল করিয়া ইহার দিকে তাকাইয়া লক্ষ্য করিলাম। লোকটীর হাতে একটী জর্‌মান-সিল্‌ভরের তৈয়ারী ঘট রহিয়াছে; ঘটটীর গায়ে প্রচুর সিন্দুর কুঙ্কুম ও চন্দন লেপা, গলায় ফুলের মালা জড়ানো, এবং ঘটের একটী ঢাকনী আছে, সেটী ঘটের গায়ের সঙ্গে তালা দিয়া আঁটা। বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইল, লোকটী ভিক্ষা চাহিতেছে, দেবসেবার জন্য ভিক্ষা বা চাঁদা চাহিতে বাহির হইয়াছে। লোকটীর রঙ্গ কালো ও কাঁধে পইতা নাই, তাই বুঝা গেল যে, সে ব্রাহ্মণ নহে; কিন্তু প্রকৃতই সে কেন ট্রেনের কামরায়-কামরায় ভিক্ষার জন্য ঘুরিতেছে, তাহা বুঝা গেল না। খানিকক্ষণ বক্তৃতা দিবার পরে, আমাদের অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করিয়া, সে ধাতু-নির্মিত ঘটটী ট্রেনের যাত্রীদের সামনে ধরিতে-ধরিতে গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। করিডর-গাড়ী ছিল বলিয়া ইহা সম্ভবপর হইল। যতক্ষণ সে বক্তৃতা দিতেছিল, লক্ষ্য করিলাম, ততক্ষণ যাত্রীরা একটু শ্রদ্ধামিশ্রিত-ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। বক্তৃতা-সমাপনান্তে পাত্রটী লইয়া একে-একে উপবিষ্ট যাত্রীদের সমক্ষে

আগাইয়া দিতে লাগিল। যাহার সামনে আসিল, পুরুষ বা স্ত্রী নির্বিশেষে সে একটী কি দুইটী পয়সা কিংবা একটী আনী লইয়া ঢাকনীর মাথায় একটী ছিদ্র ছিল, তাহার ভিতর দিয়া ঘটে ফেলিয়া দিতে লাগিল। আমরা এই ব্যাপার দেখিতেছিলাম, এবং তিনজনে বাঙ্গালী সুলভ অশ্রদ্ধার ভাবে বলাবলি করিতেছিলাম—"এই মন্দিরের দেশে যেখানে যত-তত্র বিরাট্-বিরাট্ মন্দির, আর মন্দিরের সেবার জন্য তার উপযুক্ত জমীদারী আর অন্য বন্দোবস্তের ছড়াছড়ি, সেখানে ঠাকুর-পূজার খরচের জন্য গরীব যাত্রীদের উপর এই ট্যাক্স বসানো কেন বাবা"—ইত্যাদি। ইতিমধ্যে ট্রেনের কতকগুলি যাত্রীর দান লইয়া ঘট-হস্তে সে আমাদের সামনে উপস্থিত। পয়সা পড়িলে সে একটী আশীর্বচনের মত তামিল বাক্য সুর করিয়া বলিতেছে, কেহ কিছু না দিলেও সেরূপ অন্য বাক্য বলিয়া প্রশান্ত-মুখে অন্যত্র যাইতেছে। আমাদের সামনে আসিতেই আমরা ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলাম, কিছু হইবে না—আমাদের মুখে যেন লেখা ছিল—"মাফ করো বাবা।" দ্বিরুক্তি না করিয়া পাত্র লইয়া অন্য যাত্রীদের সামনে গিয়া সে খাড়া হইল।

ট্রেনে আমাদের পিছনকার বেঞ্চে একটী তামিল সহযাত্রী ছিল। লোকটীর সঙ্গে দুই-একটী কথা হইয়াছিল, হিন্দীতে। অতি সাধারণ মানুষ সে। আমরা কি করি সে দেখিতেছিল। আমাদের মধ্যে বোধ হয় অশ্রদ্ধার ভাবটা একটু ফুটিয়া-ই উঠিয়াছিল। সে আমাদের আহ্বান করিয়া বলিল—"মহারাজ, ইয়ে আদমী ক্যা বোলা, আপ সমঝা নেই?" আমি বলিলাম,—"নেহি; উ কৌন্ হৈ? পূজাকে ওয়াস্তে ভীখ মাঙ্গতা হৈ? ব্রাম্হণ তো নেহি?" লোকটী বলিল—"নেহি মহারাজ, নেহি। উও এক বড়্ডা চেট্টি হৈ। তীন চার জগহ মেঁ উস্‌কা

তীন চার গাদী (গদ্দী) হৈ। বহুৎ রুপেয়া হৈ। কঈ লাখ রুপেয়া খরচ কর্‌কে এক মন্দিল্ বনায়েগা। সব রুপেয়া আপ হী আপ দেগা। পর, ভিট্‌শা (ভিক্ষা) কে ওয়াস্তে নিকলা হৈ। সব আদমীসে এক পয়সা দো পয়সা লেগা, কলস ভরতী হো জায়গা, তব রুপেয়া পূরা কর্‌কে মন্দিল্ বনায়েগা। সব লোগকে দান ঔর মদদ সে মন্দিল্‌কা কাম পূরা করেগা। পুণ্য কাম মেঁ সব্‌কু সরীক বনায়েগা। এসা কর্‌না বহুত আচ্ছা হৈ, ইসীসে সব কঈ দেতা হৈ।"

ব্যাপারটা বুঝিলাম, চোখের সামনেকার পরদা যেন কেহ তুলিয়া দিল। বহুলক্ষ টাকার মালিক শ্রেষ্ঠী, তিন চারিটী বড-বড গদীর মালিক,—তামিল-দেশের চেট্টি বা শ্রেষ্ঠীদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে তাঁহার ইষ্টদেবের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তিন-চার লক্ষ টাকা খরচ করিবেন। কিন্তু এই পুণ্য কাজ তাঁহার একার নহে। সমস্ত সমাজের অনুকম্পা ও সহায়তা তিনি চাহেন, সকলেই তাঁহার পুণ্য-কর্মে অংশ-গ্রহণ করুন, ইহা তাঁহার প্রার্থিত। তাই, তাঁহার যে ব্যয় হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিবেন—ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা। কলসটী পূর্ণ করিয়া যে টাকা পয়সা হইবে, তাহা যেন তাঁহার নিজের আহৃত অর্থের উপরে রাখিয়া তিনি তাহার পূরণ করিবেন। এই জন্য তিনি ধাতুময় ঘট লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, প্রস্তাবিত পুণ্য-কর্মের কথা সকলকে বলিয়া ভিক্ষা চাহিতেছেন। লোকেও নাম মাত্র দান দিতে পাইয়াও কৃতার্থ হইতেছে।

এই ব্যাপারটীর পিছনে যে কতখানি বিনয় ও দীনতা-বোধ আছে, দেশের ও দশের প্রতি কতটা সম্মাননা ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইল, এবং সর্বোপরি ইহাতে নিজ উপাস্যের প্রতি কতটা ভক্তি-ভাব আছে, তাহা ভাবিয়া আমাদের চোখে জল আসিল। আমরা উঠিয়া গিয়া

আমাদের যৎকিঞ্চিৎ দুই-এক আনা দান সসম্ভ্রমে পাত্রের মধ্যে দিয়া আসিলাম, নিজেদের ধন্য মনে করিলাম। হৃদয়ের অজ্ঞাতসারে এই কাজের সার্থকতার জন্য এক প্রার্থনা আমার মনের গভীর অন্তস্তল হইতে জাগিয়া উঠিল, এবং অব্যক্ত আকুলতা আসিয়া আমার প্রাণকে পূর্ণ করিল। মনে-মনে আমি শঙ্কর-নারায়ণকে প্রণাম করিলাম, তাঁহার পতাকাবাহী ভৃত্য চেট্টিটীকেও প্রণাম করিলাম।

ইতিমধ্যে পরের স্টেশন আসিয়া গেল। আমাদের চেট্টি গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন।

পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি

বঙ্গীয়-পুরাণ-পরিষদের সভাপতি, পরিচালক ও সদস্যবৃন্দ, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, তথা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও স্নাতকগণ—

আপনারা আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার এবং অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। পুরাণ-পরিষদের পরিচালকবর্গ এই বৎসর পরিষদের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিতে আহ্বান করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে যে-সকল দেশপূজ্য পুণ্যশ্লোক মনীষী এই উৎসব উপলক্ষ্যে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, বিশেষতঃ পুরাণ-শাস্ত্রে অলব্ধ-প্রবেশ মাদৃশ অনধিকারী জনের আপনাদের সমক্ষে কিছু বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, আমার নিজের কাছে নিতান্তই অশোভন এবং স্পর্ধার কার্য বলিয়া মনে হয়। তথাপি, আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হিন্দু চর্যা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ ও সাধন স্বরূপ পুরাণ ও রামায়ণ-মহা-

ভারত সম্বন্ধে অন্য হিন্দুর ন্যায় আমি মনে-মনে বিশেষ গৌরববোধ পোষণ করি; এবং আপনারা স্নেহশীল চিত্তে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন; এই উভয় কারণে, আমি আপনাদের প্রদত্ত অদ্যকার দিনের কার্যভার শিরোধার্য করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীশ্রীমহাপূজা অবসিত; কিন্তু পূজার বাদ্য ও ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গে, পূজা-প্রকোষ্ঠে ও মণ্ডপে সপ্তশতী চণ্ডীর উদার শ্লোকরাশির স্নিগ্ধোদাত্ত ধ্বনি এখনও আমার কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহার রেশটুকু এখনও মিলায় নাই; পূজার ধূপ-ধূনার সৌরভের সঙ্গে-সঙ্গে এই নিরানন্দ দেশে এই কয়দিনে শিশুদের কলরবে ও গৃহপ্রত্যাগত প্রবাসীর মুখের হাসিতে যে আনন্দের আভাস আনিয়াছে, তাহার স্মৃতি এখনও আমাকে আকুল করিতেছে। সমস্ত বঙ্গদেশ এখন জগজ্জননী উমার জয়গানে নিযুক্ত, যে জগজ্জননীর মহিমা পুরাণেই প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হইয়াছে; নৈরাশ্যপূর্ণ বর্তমানকে ভুলিয়া কয়দিনের জন্য যেন বাঙ্গালী জাতি পুরাণের শাশ্বতত্বে, অতীতের চিরন্তনত্বে ডুবিয়া গিয়া, অনন্তের প্রবহমান ভাবধারায় অবগাহন করিয়া, সংবৎসরের জন্য, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য চিত্তশুদ্ধির পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। এইরূপ শুভ অবসরে পণ্ডিত-সজ্জন সকাশে পুরাণ-মহিমা শ্রবণ ও শ্রাবণ লোভনীয় বস্তু বলিয়া মনে হয়; সেই হেতুও আপনাদের আদেশ পালন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ, হিন্দু ধর্ম ও চর্যার প্রধান গ্রন্থ। বেদ-উপনিষদ্ আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চর্যার ভিত্তি স্বরূপ পরোক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে বটে, কিন্তু যে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম অবস্থান করিতেছে, যে শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কায়া বলিতে পারা যায়, সে শাস্ত্র হইতেছে আমাদের ইতিহাস ও পুরাণ। আমাদের দেশে নব-সৃষ্ট এরূপ একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে, যে

মতবাদে ইতিহাস ও পুরাণের প্রকৃত মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রক্ষা করা হয় নাই। এই-সকল মতবাদ অনুসারে, ভারতের ধর্মচিন্তার ইতিহাসে সোপনিষদ্ বেদ অথবা কেবলমাত্র উপনিষদ্ একমাত্র আলোচনীয় পুস্তক, বেদেতর বা উপনিষদিতর অন্য শাস্ত্র অগ্রাহ্য; এবং এইরূপ মতবাদ যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের অনেকের মনে পরিস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস এই যে, ভারতের অথবা হিন্দুজাতির ইতিহাসে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ চিন্তা তাহার চরম বিকাশ উপনিষদের যুগে ঘটিয়াছিল, তদনন্তর অথবা তদতিরিক্ত আর যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে—যথা তন্ত্রশাস্ত্র বা আগম-শাস্ত্র, ভক্তিবাদ, পৌরাণিক ধর্ম ও অনুষ্ঠান—এ সমস্তই ভুল, এ সমস্ত না হইলে হিন্দুজাতির পক্ষে মঙ্গল ছিল, এ সমস্তই ক্রমিক অবনতির লক্ষণ। উপনিষদের শুভ্র জ্যোতির আতিশয্য-হেতু এবং ধর্ম-সাধনায় পথ-বিশেষের প্রতি ইঁহাদের অত্যন্ত অনুরাগ অথবা পথান্তরের প্রতি সমধিক বিরাগ হেতু, ইঁহাদের দৃষ্টিশক্তি অন্য বস্তুকে স্বরূপে দর্শন করিতে অক্ষম। আমাদের জাতির ধর্ম ও চর্যার ইতিহাসে, বিগত যুগের ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায়, বহু আলোচনার পরে একটি ক্রম-বিবর্তন স্থিরীকৃত হইয়া সকলের দ্বারা এক প্রকার স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। ক্রম-বিবর্তনটী এই যে,—প্রথমে বেদ-সংহিতা, পরে উপনিষদ্, ও তৎপরে পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র;—এই ক্রম অনুসারে, উপনিষদ্ অপেক্ষা পুরাণাদি শাস্ত্র অর্বাচীন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সহিত শাস্ত্রের পৌর্বাপর্যের সংযোগ বা সম্বন্ধ আছে, এই ভ্রান্ত ধারণার পোষকতা যাঁহারা করেন, তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে অর্বাচীনতর পুরাণাদি শাস্ত্র, প্রাচীনতর বেদ ও উপনিষদ্ অপেক্ষা অপকৃষ্টতর, এবং পূর্ণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেষ্টার সহিত আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু বেদ ও উপনিষদ্, এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদি—ইহাদের

আপেক্ষিক পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত, অন্ততঃ মাত্র আংশিক ভাবে সত্য ; এই তথ্যেই এখন আধুনিক আলোচনার ফলে আমরা উপনীত হইতেছি। পুরাণাদি তথাকথিত অবাচীন শাস্ত্রের মূল বস্তু, বেদ অপেক্ষা আধুনিক নহে ; হিন্দু-চিন্তার ইতিহাসে, পুরাণের ভাবধারা বেদেরই পরিপূর্তি—বেদ ও পুরাণ, নিগম বা শ্রুতি ও আগম, উভয়ের সমন্বয় ও উচ্ছেদ্য মিলনের ফলে হিন্দু ধর্ম ও চর্যার পত্তন। হিন্দুর ইতিহাসে পুরাণকে অশ্রদ্ধা করিলে চলে না, পুরাণের অবশ্যম্ভাবিতা ও নানাবিষয়িনী শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করিতেই হয় ; আধুনিক বিচার-শৈলী অনুসারে আমরা এই সকল সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। ঐতিহাসিক আলোচনার দিক্ হইতে, হিন্দু সভ্যতার বিকাশে পুরাণের স্থান যে অতি উচ্চে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। হিন্দু সভ্যতার স্বরূপটী বুঝিবার জন্য এই প্রকার ঐতিহাসিক আলোচনার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনা বিশেষ একটী বিদ্যা মাত্র, এবং বিদ্যা-পদবাচ্য আলোচনা বলিয়া ইহা অনধিকারী জনসাধারণের জন্য হইতে পারে না—এই দিক্ দিয়া পুরাণ-আলোচনা কেবল পণ্ডিতগণ-মধ্যেই নিবদ্ধ, জনগণের ইহাতে বিশেষ আস্থা বা ইহার সম্বন্ধে তাদৃশ ঔৎসুক্য হইতে পারে না ; সুতরাং সমাজের পক্ষে ইহার সার্থকতা তাদৃশ প্রবল নহে ; পণ্ডিতের বিচারের বস্তু হইয়া বাদ-বিতণ্ডা মত-বিশেষের খণ্ডন-মণ্ডনেই এই প্রকার আলোচনা পর্যবসিত হইবার সম্ভাবনা অধিক,—মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে, তাহার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ইহার সংযোগ প্রায় কিছুই থাকে না। অবশ্য, মানসিক অনুশীলন বা চর্যার পক্ষে এই প্রকার আলোচনার একটী প্রধান স্থান আছে, ইহা স্বীকার্য ; কিন্তু তদতিরিক্ত আরও কিছু না পাইলে, আলোচনার বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের আত্মীয়তা-বোধ বা প্রীতি উৎপন্ন হইতে পারে না,

সাধারণ ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষই থাকে। কিন্তু পুরাণ আমাদের দেশে কেবল পণ্ডিতের উপজীব্য, মৃত বা মৃতকল্প বিদ্যামাত্র নহে; ইহা তদতিরিক্ত অনেক কিছু; পুরাণ কেবল কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে নিবদ্ধ বিশেষ কোনও ভাষা বা শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় শিষ্টজনের-ই আলোচ্য বস্তু মাত্র নহে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে ইহা একটী বিরাট্ ভূভাগের সমগ্র অধিবাসী-বৃন্দের হৃদয়-স্পন্দনের সহিত জড়িত; আধিভৌতিক অর্থাৎ রক্ত-মাংসের দেহের মত-ই ইহা জাতির আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক দেহ; ইহা পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত রিক্থের এক অশরীরী অংশ। এই রিক্থকে এতদিন ধরিয়া হিন্দু যে ভাবে আঁকড়াইয়া রক্ষা করিয়া আছে, তাহা জগতে অন্য জাতির মধ্যে দেখা যায় না; এবং এই রিক্থকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিবার চেষ্টাই তাহাকে চিরকাল ধরিয়া অপূর্ব শক্তি দিয়াছে, বহু পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজ প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশের পথে অবিচলিত গতিতে তাহাকে চালিত করিয়াছে। বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব, ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব যাহা, তাহা ইতিহাস ও পুরাণের আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুর ব্যক্তি-গত, গোষ্ঠী-গত ও জাতি-গত নানা সমস্যা ও সমাধান, তাহার রূপকথা ও ইতিহাস, তাহার ভূয়োদর্শন ও চিন্তা, তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান ও ভাব-জগৎ, তাহার ভোগ ও ত্যাগ, অনুরাগ ও বিরাগ, তাহার আশা ও আশঙ্কা, আদর্শ ও জুগুপ্সা, শৌর্য ও ভীরুতা, তাহার শৈশব-স্মৃতি ও বার্ধক্যের বিচার—সমস্তই রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে আনিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ জীবনের-ই মত বিরাট্, অখণ্ড, সর্বঙ্কর, সর্বংসহ; সদ্ভাব ও বিরোধ উভয়েই পূর্ণ,

সঙ্গতার্থ এবং অসঙ্গতার্থ উভয় প্রকারের বাণী বা বচন পুরাণে বিদ্যমান। বহু শতাব্দী ধরিয়া একটী বিশাল জাতির সমগ্র জীবনের প্রতীক-স্বরূপ পুরাণ উপেক্ষণীয় নহে। হিন্দুর জ্ঞান-সাধনার পরিচয় এই পুরাণের মধ্যেই নিহিত আছে—প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ, শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহারিক শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গেলে, পুরাণগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিতে হয়।

পুরাণের মধ্যে নিহিত যে শাশ্বত আদর্শ-সমূহ দুই তিন সহস্রক ধরিয়া হিন্দুর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে, সেই আদর্শগুলির কার্যকারিতা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বরঞ্চ, অধুনাতন কালে আমাদের জীবনে পুরাণের শিক্ষা ও সাধনার আবশ্যকতা যতটা অধিক ভাবে অনুভূত হইতেছে, ততটা প্রাচীন কালে ছিল কি না সন্দেহ। এখন আমাদের সমাজ, বিশেষতঃ গত দুই-তিন দশকের মধ্যে, যতটা আত্ম-হারা, যতটা কেন্দ্রচ্যুত, যতটা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ততটা পূর্বে কখনও হইয়াছিল কিনা জানি না; বোধ হয়, ততটা কখনও হয় নাই। জীবন-যাত্রা এতাবৎ সরল ছিল, সহজ ছিল; দেশের আপামর সাধারণ একটী সর্বজন-গ্রাহ্য philosophy of life অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চের সহিত মানব-জীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে একটা ধারণা, ও তদনুসারে একটী discipline of life অর্থাৎ-জীবন-যাত্রার-নিয়ামক একটী বিনয় বা পরিপাটী স্থির করিয়া লইয়াছিল, এবং তদনুসারে সকলেই চলিতে চেষ্টা করিত। এখন আমরা এই philosophy ও discipline, এই অবলোকন-শক্তি ও বিনয়-পরিপাটী, উভয়ই হারাইতে বসিয়াছি, বহু স্থলে হারাইয়াও ফেলিয়াছি। নূতন কোনও philosophy, যোগ্যতর অর্থাৎ যুগোপযোগী নূতন কোনও discipline এখনও আমরা পাই নাই। এখন ভাঙ্গনের দশা; কাল-বৈশাখীতে সমস্ত জগৎ ছাইয়া

ফেলিয়াছে, আমাদের সমাজ-তরী প্রতিকূল বায়ু ও স্রোতের মুখে পড়িয়া কোন্ বিশালাক্ষীর দহে গিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, জানি না; কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-সাধ্য মানবের অবস্থা-পরিবর্তনের স্রোতে আমরা তো জড় কাঠ-কুটার মত গা ভাসাইয়া দিতে পারি না, আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে, কি উপায়ে আমরা ঝড়-জল কাটাইয়া উঠিতে পারি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও তন্নিহিত ভাব-সম্পদ্ আমাদিগকে এখন অবস্থা বুঝিয়া চলিতে সাহায্য করিতে পারে।

পুরাণ-কথা ও তন্নিহিত গভীর ও উচ্চ ভাবাবলী, ভারতীয় সভ্যতার আদিম অবস্থা হইতেই এদেশীয় জনগণের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। বহু বিভিন্ন জাতির মিলনে আমাদের ভারতীয় হিন্দু-জাতির উদ্ভব। ভারতের (অথবা অন্য কোনও দেশের) প্রাচীন সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনায় নিযুক্ত হইবার পূর্বে, আধুনিক মনোভাব অনুযায়ী অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রথমেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয়; অন্যথায়, আলোচনা সার্থক হয় না, সমদর্শী ও সর্বগ্রাহী হয় না—একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ এবং নিরর্থক থাকিয়া যায়। এই দুইটী প্রতিজ্ঞা গ্রহণে কাহারও আপত্তি উঠিতে পারে না, এবং সে আপত্তি আজিকার দিনে কেহ গ্রাহ্যও করিবে না। প্রতিজ্ঞা দুইটী এই; এক—ভারতের ও ভারতীয় মানবের ইতিহাস, জগতের অর্থাৎ ভারতের বাহিরের সমগ্র বিশ্বের মানবগণের ইতিহাসের-ই অন্তর্ভুক্ত, এক অখণ্ড মানব-প্রচেষ্টার অংশ-রূপেই আমাদের ভারতের মানব-প্রচেষ্টাকে ধরিতে হইবে, ইহার বহির্ভূত রূপে নহে; এবং, দুই—কোনও বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় বা শ্রেণী, বিশেষ-রূপে ভগবানের অনুগৃহীত হইতে পারে না—প্রাচীন ইহুদী, প্রাচীন ও আধুনিক খ্রীষ্টান ও মুসলমান, জাপানী ও চীনা প্রভৃতি বহু

জাতির (এবং ব্যবহারিক জীবনে ব্রাহ্মণাদি বহু ভারতীয়ের) মধ্যে তথা বহু অসভ্য জাতির মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আরোপকারী এইরূপ অনুচিত বিশ্বাস বিদ্যমান দেখা যায়। শিষ্টজনের উচিত, এইরূপ মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা ; গীতায় উক্ত সর্ব-জীব ও সর্ব-জাতির প্রতি ঈশ্বরের পক্ষপাত-শূন্য সমদৃষ্টিতে আস্থা স্থাপন পূর্বক, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির কত বিচিত্র প্রকাশ ও বিলাস হইয়াছে সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া, কি ভাবে বিভিন্ন জাতি-সমূহের কৃতিত্ব পরস্পরকে সম্পূরণ করিয়া, এক অখণ্ড, সর্বাবলম্বী, সমবায়-মূলক মানব-জাতির কৃতিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার চর্চা করা, এবং এই কার্যে প্রত্যেক জাতিকে তাহার চেষ্টার ও সার্থকতার অনুরূপ জয়মাল্য অর্পণ করা।

এই প্রতিজ্ঞা দুইটী মানিয়া লইলে, যুক্তিতর্কানুমোদিত ঐতিহাসিক আলোচনায় স্পষ্টীকৃত হয় যে, ভারতের বাহির হইতে আর্যজাতি তাঁহাদের চর্যা ও ধর্ম-নীতি তথা পুরাণ-কথা লইয়া এদেশে আগমন করেন। এদেশে আর্যজাতির আগমনের পূর্বে, দ্রাবিড় ও কোল জাতীয় অনার্যগণ বাস করিতেন। এই অনার্যদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল, নিজ ধর্ম ও অনুষ্ঠান, নিজ ইতিকথা ও পুরাণ ছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আর্যের ধর্ম ও সমাজ এবং অনার্যের ধর্ম ও সমাজ, বহু বিষয়ে পৃথক্ ছিল। আর্য ও অনার্যের প্রথম সংঘর্ষের পরে, উভয় জাতির মধ্যে মিলন ঘটিল, এবং আর্য ও অনার্য জাতি ও ধর্ম মিলিয়া হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতি ও ধর্মের উদ্ভব হইল। এই মিলন-সঞ্জাত নবীন সভ্যতা ও ধর্মের বাহন হইল আর্যের ভাষা সংস্কৃত। ধর্ম-বিশ্বাস, দেবতা-বাদ, আচার ও অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও পুরাণ-কথা উভয় জাতির নিকট হইতেই গৃহীত হয়, এবং ধীরে-ধীরে এই সমস্ত বিষয় সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত

হইয়া চিরতরে রক্ষিত হইয়া থাকে। আর্যের সভ্যতার ও ধর্মের নিদর্শন অনেকটা অবিমিশ্র-রূপে আমরা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় পাই। পরবর্তী যুগে বিশুদ্ধ আর্য ধর্ম ও মতবাদ, ধীরে-ধীরে অনার্য তথা মিশ্র আর্যানার্য ধর্ম ও মতবাদের প্রভাবে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতে থাকে—আর্যের অনুষ্ঠিত উপাসনা রীতির সহিত অনার্যের উপাসনা-রীতির একটা অচ্ছেদ্য সমন্বয় সাধিত হইয়া উঠে। হোম, আর্যদের রীতি; ব্রাহ্মণাদি তিন দ্বিজ-বংশেরই হোমে অধিকার, শূদ্রের ইহাতে অধিকার নাই। বেদে ও অন্য বৈদিক সাহিত্যে আমরা কেবল হোমেরই কথা পাই—পুষ্প-চন্দন অক্ষতাদি দ্বারা পূজার উল্লেখ পর্যন্তও বৈদিক সাহিত্যে কুত্রাপি নাই। পূজার অনুষ্ঠানটী মূলতঃ অনার্যদেরই অনুষ্ঠান বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক হিন্দুজনগণের মধ্যে যে-সমুদয় দেবতার পূজা প্রচলিত—যাঁহারা হিন্দুজাতির প্রথম ও প্রধান শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করেন,—ঋগ্বেদের দেবসভায় তাঁহাদের স্থান অপ্রধান ও নগণ্য, বৈদিক উপাসনায় তাঁহাদের আবাহন নাই বলিলেই হয়। অথচ হিন্দুধর্মে শিব ও উমা, বা বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনার মত মহীয়সী কল্পনা আর কোথায়? সমস্ত পুরাণ ইঁহাদেরই অনন্ত মহিমা বর্ণনে নিযুক্ত, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও দর্শন ইঁহাদেরই শ্রীচরণ বেড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। পুরাণ-বর্ণিত দেব-কল্পনা ও দেব-লীলা হঠাৎ একদিন বেদের পরবর্তী কোনও কালে হিন্দুর মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। বহু শত বৎসর ধরিয়া, বেদের সময় হইতেই (এমন কি তাহার পূর্ব হইতেই), পুরাণের প্রধান দেব-কাহিনীগুলি কোন না কোন রূপে বিদ্যমান ছিল, ইহা অনুমিত হয়; অবশ্য হিন্দুজাতির কল্পনা ও দর্শন-শক্তির প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে-সঙ্গে পরে সেগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করে—কাব্য-সৌন্দর্য্য ও সত্য-দর্শনের আলোক দ্বারা সেগুলি উদ্ভাসিত হয়।

পৃথিবীর মানব-কল্পনা এবং মানবের চিন্তা, ঈশ্বরের সত্তাকে ও স্বরূপকে শব্দের দ্বারা ও রূপ-সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করিবার জন্য যুগে-যুগে দেশে-দেশে নানাবিধ প্রয়াস করিয়াছে—কিন্তু উমা ও শিব, শ্রী ও বিষ্ণুর প্রতীককে আশ্রয় করিয়া মানুষের এই কল্পনা ও চিন্তা ভারতবর্ষে যেরূপ গভীর-ভাবে ও যতটা ব্যাপক-ভাবে ব্রহ্মের আস্বাদন করিতে আমাদের সহায়তা করিয়াছে, সে-ভাবে পৃথিবীর আর কোথাও মানবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই ; বিভিন্ন ধর্মের সামান্য মাত্রও তুলনা-মূলক আলোচনা যিনি করিবেন, তিনিই এই কথা স্বীকার করিবেন। শিব ও উমা—শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভারতবর্ষে বেদ-রচক আর্যদের আগমনের পূর্বেই বিরাজ করিতেছিলেন, এমন কি লিঙ্গ ও গৌরীপট্টময় তাঁহাদের প্রতীকও যে ভারতবর্ষে আর্য-পূর্ব যুগেও বিদ্যমান ছিল ও লোকের নিকট পূজিত হইত, তাহার প্রমাণ দক্ষিণ-পাঞ্জাবে হড়প্পাতে ও সিন্ধু-প্রদেশে মোহেন-জো-দড়োতে (যেখানে আর্য-পূর্ব যুগের বিশাল নগরীর সুবৃহৎ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানে) পাওয়া গিয়াছে। পুরাণে হর-পার্বতীর যে লীলা প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মূল উৎস যেমন এক দিকে আর্যদের মূল-গ্রন্থ বেদে গিয়া খুঁজিতে হয়, তেমনি অপর দিকে তাহা বেদ-পূর্ববর্তী মোহেন্-জো-দড়োর যুগের আর্যেতর জাতির ধর্ম এবং দেবার্চনা-রীতির সম্পর্কিত নানা নিদর্শন হইতেও দেখা যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে যে-সকল গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা পুরাণে পাওয়া যায়, সেগুলি আংশিক-ভাবেও যে আর্য-পূর্ব যুগের, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। হিন্দুধর্মের সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে যোগ ; এই যোগ-সাধন পদ্ধতিও যে প্রাগ্‌বৈদিক, অনার্য,—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস আমরা মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে পাইতেছি। সৃষ্টি-প্রকরণ—ক্ষীরাব্ধিতে অনন্ত-

শয্যায় শয়ান নারায়ণ, তাঁহার নাভিজাত-কমলে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান, মধুকৈটভ-বধ প্রভৃতি ব্যাপার; সাগর-মন্থন; দেবাসুর-যুদ্ধ, শক্তির আবির্ভাব; দশাবতার কথা; ইত্যাদি শত-শত দেব-কাহিনী আছে; ঐতিহাসিক বিচারের দিক হইতে এগুলির গভীর ভাবে আলোচনা হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত কাহিনী, পূরাপূরি বৈদিক জগৎ হইতে লব্ধ নহে, বেদ-বহির্ভূত অনার্য জগতেও ইহাদের অনেকগুলি রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। উপস্থিত এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া জানিবার উপায় আমাদের নাই—হয় তো অদূর ভবিষ্যতে নূতন আবিষ্কার-দ্বারা আহৃত প্রাচীন শিল্পাদির নিদর্শনের সাহায্যে পূর্ণ আলোচনার ফলে, আমাদের নিকটে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

দেব-কাহিনীর মত ইতিহাস-কথা—প্রাচীন রাজগণের জীবনী ও কীর্তির কথা, যাহা পুরাণে ও রামায়ণ-মহাভারতে রক্ষিত আছে, সেই ইতিহাস-কথাও যে দেব-কাহিনীর মত কতক অংশে আর্যেতর জাতিরও প্রাচীন ইতিকথাকে রক্ষা করিয়া আছে, সে সম্বন্ধেও অনুকূল মত ও যুক্তি প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজন্য বা ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি এবং ইতিকথা যে অনেকটা অনার্য জাতিরই রীতি-নীতি এবং ইতিকথা, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে আলোচনা এখনও অনেকটা জল্পনা-কল্পনার আকারেই চলিতেছে। এখনও এ বিষয়ে সর্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই। তবে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে উপস্থিত যে দিকে হাওয়া বহিতেছে, সেদিনের কথা একটু উল্লেখ করিয়া রাখিলাম।

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই :—ভারতের পুরাণের ধারা, আর্য ও অনার্য উভয় জাতির দেবতাবাদ ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান; পুরাণের মূল উৎস, আংশিক-ভাবে বেদেরও পূর্বেকার যুগে ভারতে

প্রচলিত দেব-কাহিনী ও রাজ-কাহিনী। আর্য এবং অনার্যের মিশ্রণের ফলে হিন্দুজাতির উদ্ভব ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে, অনার্য পুরাণও আর্য-ভাষায় গ্রথিত হইতে থাকে ;—কোথাও সংস্কৃতে, কোথাও প্রাকৃতে ; এবং অবশেষে, গুপ্তবংশীয় সম্রাট্দের রাজ্যকালে, ব্যাসদেবের নামের সঙ্গে পুরাণ-কাহিনীগুলিকে জড়িত করিয়া, রামায়ণ-মহাভারতের পাশে পুরাণগুলির শেষ সংস্কৃত রূপ হিন্দুজন-মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃত রূপ দিবার আবশ্যকতা ছিল ; অন্যথা সমগ্র ভারতে প্রচারের সম্ভাবনা ছিল, কারণ সংস্কৃতভাষাই হিন্দুভারতকে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের দ্বারা চালিত ভারতকে, এক-সূত্রে বাঁধিয়া, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নানা প্রদেশকে মিলিত করিয়া এক অখণ্ড দেশে পরিণত করিয়াছিল। সংস্কৃতে রূপ দেওয়ার ফলেই এগুলিকে আরও পরিবর্তিত বা বিকৃত করিবার সম্ভাবনা কম হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সংস্কৃত রূপ ছিল পণ্ডিতের আলোচনার জন্য ; পুরাণের প্রাচীন কাহিনীগুলি, দেশভাষাতেও জনসমাজমধ্যে প্রচলিত ছিল,—প্রাকৃতে, দ্রাবিড় ভাষায় ও সম্ভবতঃ অস্ট্রিক বা কোল ভাষায়। এখন যেমন নিরক্ষর কৃষক বা শ্রমিক, অথবা ভদ্রঘরের অশিক্ষিত ব্যক্তি, বাঙ্গালা বা হিন্দী বা তামিল ভাষাতেই পুরাণের গল্প শুনে ও শিখে, এবং সেগুলি হইতে জীবনের শ্রেষ্ঠ রসায়ন সংগ্রহ করে, তখনও তাহাই করিত ; প্রাকৃতে, প্রাচীন তামিলে বা প্রাচীন কানাড়ীতে এইরূপ পুরাণের গল্প প্রচলিত থাকার প্রমাণ আমাদের হাতে যথেষ্ট আছে। ভারতের গণ-চিত্ত কখনও পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ হারায় নাই। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের কথা ভাষায় শুনিলে মানুষ রৌরব নরকে যাইবে—এইরূপ উক্তি, অর্বাচীন কালের কোন্ ইতিহাসানভিজ্ঞ মূর্খের রচনা তাহা জানি না। এইরূপ উক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, প্রাচীনকালে লোক-

ভাষায় পুরাণাদির প্রচার ছিল না এইরূপ কল্পনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক ব্যাপার।

মুসলমান রাজত্বের পূর্বে, প্রাচীনকালে সংস্কৃতেতর লোকভাষায় পুরাণ যে ছিল, তাহা আমাদের আধুনিক আর্য ও দ্রাবিড় ভাষায়, পুরাণ ও ইতিহাসের কতকগুলি পাত্র-পাত্রীর নামের রূপ হইতে বুঝা যায়। আজি হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের পূর্বপুরুষগণ, সংস্কৃত শব্দ 'কৃষ্ণ', 'রাধিকা', 'অভিমন্যু' প্রভৃতির প্রাকৃত রূপ 'কণ্‌হ', 'রাহিআ', 'অহিবন্নু' বলিতেন ; তাই না আমরা এই-সব প্রাকৃত নামের আধুনিক বাঙ্গালা রূপ 'কানু', 'রাই', 'আয়ান' এখনও ভুলিতে পারি নাই, এবং ইহাদের প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ 'কান্‌হ', 'রাহী', 'আইহণ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রমুখ প্রাচীন পুঁথিতে নাই। এইরূপ যে কত প্রাকৃত রূপ পরবর্তী কালে মূল সংস্কৃত রূপের দ্বারা ভাষা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই কারণেই উত্তর-ভারতে হিন্দীতে, সংস্কৃত শব্দ 'সীতা-'র পাশে উক্ত শব্দের প্রাকৃতজ রূপ 'সীয়, সিয' এখনও পাওয়া যায়, 'লক্ষ্মণ'-এর পাশে 'লখন', এবং প্রাচীন হিন্দীতে 'রাম'-এর যে একটী প্রাকৃতজ রূপ 'রাওঁ' ছিল, তাহারও ইঙ্গিত আমরা পাই। তামিলে প্রাচীন কাল হইতেই প্রধান পৌরাণিক দেবতা-দের বিশুদ্ধ দ্রাবিড় নাম পাই—'মাল্‌' অর্থাৎ বিষ্ণু, 'পেরু-মাল্‌' অর্থাৎ মহাবিষ্ণু, 'অয়ন্‌' অর্থাৎ ব্রহ্মা ; 'শিবন্‌' বা 'শিব' শব্দটিকেই কেহ-কেহ দ্রাবিড় ভাষার-ই শব্দ বলিয়াছেন ; উমার এক তামিল নাম 'কোর্‌রবৈ' ; গণেশ 'পিল্লৈয়ার্‌' রূপে পূজিত, কার্ত্তিকেয় তামিলদেশে 'মুরুকন্‌' নামে জনপ্রিয় দেবতা ; তেলেগুতে 'ত্রি-নয়ন' শিবের নাম 'মুক্কন্টি'।

কতকগুলি প্রমাণ ও যুক্তির বলে এই-রূপ বোধ হয় যে, আমাদের অধুনা-প্রচলিত সংস্কৃতে রচিত পুরাণ ও ইতিহাস, আদিম যুগে প্রাচীন

ভারতবর্ষে ছিল না। প্রাচীন আর্য যুগে ছিল, কতকটা আর্য বৈদিক ভাষায় ও কতকটা নানা আদিম অনার্য ভাষায়—দেব-কাহিনী ও রাজ-কাহিনী; এবং পরবর্তী কালে ছিল, প্রাকৃতে ও প্রাচীন তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষায়, পুরাণ-কথা। অধিকন্তু, সংস্কৃত পুবাণাদি হইতে স্বতন্ত্রাকারে সেদিন পর্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতেও কতকগুলি পুরাণ-কাহিনী বিদ্যমান ছিল। পুরাণ চিরকাল ধরিয়া ভারতের জন-গণের সাহিত্য, ভাষা-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্য বলিয়া, ইহাকে মার্জিত করিয়া লইবার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা, যতগুলি সম্ভব আখ্যানকে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন, 'পুরাণ'-নামক গ্রন্থাবলী মধ্যে গ্রথিত করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে সংস্কৃতী করণের ফলে, ও সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণের চিন্তা, দর্শন ও কল্পনা দ্বারা আলোকিত ও উন্নীত হওয়ার ফলে, এবং প্রামাণিক গ্রন্থ-মধ্যে সংগৃহীত হওয়ায়, এগুলির লোক-প্রসিদ্ধি এবং সমাজে প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত অষ্টাদশ পুবাণের ও তৎসংখ্যক উপ-পুরাণের বাহিরেও, শত-শত অন্য পুরাণ-কাহিনী এখনও বিদ্যমান; কোথাও সম্পূর্ণ পৃথক্ বা নূতন দেব-কাহিনী বা ঐতিহ্য রূপে, কোথাও বা সংস্কৃত পুরাণ ও ইতিহাস-ধৃত আখ্যায়িকা হইতে অল্পাধিক বিভিন্ন রূপের আখ্যায়িকা রূপে। হয় তো এগুলিও সংস্কৃতে নীত হইয়া ব্যাস-দেবের নামের ছাপ লইয়া পুবাণ-রূপেই পরিগণিত হইত; কিন্তু উত্তর-ভারত বিদেশীয় তুর্কী মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইবার পরে, এবং তদনন্তব মুসলমানীকৃত উত্তর-ভারতীয়গণেব দ্বারা দক্ষিণ-ভারত বিজয়ের পরে, দেশে যে অরাজকতার ও ধ্বংসেব তাণ্ডবলীলা চলিল, তাহার ফলে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষায় নূতন পুরাণ সঙ্কলন বিষয়ে আর ততটা অবহিত হইতে পারিলেন না। কেন্দ্রীভূত হিন্দু রাজ-শক্তির ও ব্রাহ্মণ

শক্তির অভাবে, নূতন সংস্কৃত পুরাণ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়া আর সম্ভবপর রহিল না, এই-সকল পুরাণের কাহিনী ও উপদেশ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রদেশেই নিবদ্ধ রহিল। দক্ষিণের প্রায় প্রত্যেক বড় তীর্থস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার লীলা অবলম্বন করিয়া বহু 'স্থল-পুরাণ' বা 'মাহাত্ম্য' আছে, তাহাদের অনেকগুলি মনোহারিত্বে অথবা প্রাচীনত্বে সাধারণ পৌরাণিক কাহিনী হইতে কোনও অংশে হীন নহে; কিন্তু 'গয়া-খণ্ড', 'কাশী-খণ্ড', 'জগন্নাথ-মাহাত্ম্য' প্রভৃতির ন্যায় এগুলি সর্বজন-স্বীকৃত পুরাণ বা উপ-পুরাণ মধ্যে স্থান পাইল না। বাঙ্গালা দেশের মঙ্গল-কাব্যগুলি পুরাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু মনসা-মঙ্গলের সতী বেহুলার কাহিনী, বা চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী, সংস্কৃতে গৃহীত না হওয়ায় ও পুরাণ-পদবী না পাওয়ায়, বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা দেশেই সীমাবদ্ধ রহিল। বৌদ্ধমতের পুরাণ বলিয়া ধর্ম-মঙ্গলে বর্ণিত লাউসেনের কাহিনীও অনাদৃত রহিল, এবং রাজা গোপীচাঁদের কাহিনীও সংস্কৃতে গৃহীত হইল না; অথচ এই গোপীচাঁদ-কাহিনী সমগ্র ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় জনগণ-মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হইয়া আছে। রামায়ণের কথা বাঙ্গালা দেশে যে-ভাবে আবহমান কাল ধরিয়া প্রচলিত, যাহার ধারাটী আমরা কৃত্তিবাস-প্রমুখ কবিগণের বাঙ্গালা রামায়ণে পাই, তাহার মধ্যে এমন দুই-একটী সুপ্রাচীন কথা আছে, যেগুলি বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণে নাই, অথচ যবদ্বীপের রামায়ণে আছে। বাঙ্গালা রামায়ণের মূলে যে বাল্মীকি-বহির্ভূত অন্য প্রাচীন রামায়ণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

বহুস্থলে আবার এরূপ দেখা যায় যে, অধুনা-প্রচলিত বিশেষ কোনও দেবলীলা-কথার কোনও অংশ বা অঙ্গ, সেই লীলা-বিষয়ক

প্রাচীত সংস্কৃত পুরাণে পাইতেছি না—পাইতেছি, পরবর্তী যুগের ভাষায় রচিত কোনও আখ্যান বা কাব্যে। দুইটী কারণে এই রূপটী ঘটিতে পারে; এক—দেবলীলার প্রাচীন-পুরাণ-বহির্ভূত এই অঙ্গ বা অংশ পরবর্তী কালের কল্পনা প্রসূত, এবং নূতন সংযোজন; অথবা, দুই—প্রাচীন পুরাণে কোনও কারণে অগৃহীত, সুপ্রাচীন কথার-ই লোকমুখে প্রচারিত রূপ অবলম্বন করিয়া, ভাষা-পুস্তক মধ্যে-ই ইহা প্রথম গ্রথিত। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ সমীক্ষার সহিত তথ্য-নির্ধারণ করিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়—প্রাচীন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ নাই, শ্রীরাধার অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লেখ নাই; অথচ হিন্দী ও বাঙ্গালা কাব্যে দানখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-লীলার দুইটী অংশ-রূপে গৃহীত, এবং শ্রীরাধা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব, পরবর্তী কাব্যে ও কবিতায় কল্পনাতেই আনিতে পারা যায় না। বাঙ্গালার প্রাচীনতম বৈষ্ণব কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে দৌত্য করিবার জন্য 'বড়ায়ি' বা জরতীকে মাত্র পাই, শ্রীরাধার ললিতাদি অষ্টসখীর নাম অজ্ঞাত, শ্রীকৃষ্ণের সুবলাদি সখা-গণও অজ্ঞাত, এবং জটিলা কুটিলার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই নাই। কৃষ্ণায়ণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বৃন্দাবন-খণ্ডের আলোচনায় এই সকল অসঙ্গতির পূর্ণ সমাধানের প্রয়াসকে পুরাণ-আলোচনার অংশ বলিয়াই ধরিতে হইবে। বাঙ্গালায় প্রচারিত শিবায়নে-ও সংস্কৃত পুরাণের অতিরিক্ত, অর্বাচীন যুগে বাঙ্গালার হিন্দুজাতি কর্তৃক গৃহীত, শিব-বিষয়ক কতকগুলি কাহিনী মিলে। বাঙ্গালার ব্রত কথাগুলিব অ-সংস্কৃত লোক-পুরাণের অন্তর্গত।

এইরূপ নানা দিক্ দিয়া, ভারতবর্ষের ধর্ম, চিন্তা ও রসসৃষ্টির প্রাচীনতম ধারা, ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির চিরন্তন অনুপ্রাণনা,

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ বিধানে ভারতের নরনারীর চির-সহচর, পুরাণ-গ্রন্থগুলি, প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের আলোচনার বস্তু হওয়া উচিত। পুরাণ-ও ইতিহাস-কথা ভারতের ঋষিগণের বাণীকে সকলের নিকট সহজ-বোধ্য করিয়া দিয়াছে, গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যকে রূপক-চ্ছলে সুলভ করিয়া দিয়াছে। ভারতের বাহিরে যেখানে-যেখানে ভারতের সভ্যতা প্রসৃত হইয়াছে, সেখানে-সেখানে ভারতের পুরাণ-কাহিনীও পহুঁছিয়াছে। শক-জাতীয় কুষাণ সম্রাট্দের (কণিষ্কাদির) মুদ্রায় 'উগ্র', 'অহীশ'বা 'বিষ-বৃষ', 'মহাদেব' নামে শিবের মূর্তি, 'বাত' নামে বায়ুর মূর্তি, 'স্কন্দ', কুমার', 'মহাসেন' নামে কার্ত্তিকেয়ের মূর্তি চিত্রিত দেখা যায়; কুষাণ সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত প্রসৃত ছিল, সুতরাং তখন ভারতের এই সমস্ত পৌরাণিক দেব-দের সঙ্গে, এবং সম্ভবতঃ পুরাণ-নিবদ্ধ ইঁহাদের লীলা-কথার সম্বন্ধে, মধ্য-এশিয়ার লোকেরাও কিছু-কিছু খবর পাইয়াছিল। কুষাণ সম্রাট্দের পরবর্তী কালে মধ্য-এশিয়ায় পঞ্চমুখ বৃষ-বাহন শিবের, হর-পার্বতীর ও শ্মশ্রুমান্ ইন্দ্রের চিত্র পাওয়া গিয়াছে; চীনে বৃষ-বাহন শিব, ষডানন ময়ূর-বাহন স্কন্দ, ও গণেশের পর্বত-গাত্রে খোদিত মূর্তি আছে। গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী চীন ও জাপানে এখনও পূজিত। মধ্য-এশিয়ার লোকেরা তথা চীন, কোরিয়া ও জাপানের অধিবাসীরা, ভারতের ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের কথা ভালরূপই জানিত—জটাজূটধারী দীর্ঘশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের তত্তৎ দেশের শিল্পীদের হাতে আঁকা অনেক চিত্র মধ্য-এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে পাওয়া গিয়াছে। মধ্য-এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে বৌদ্ধ প্রভাব-ই সমধিক ঘটিয়াছিল, সেইজন্য জাতক অবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ পুরাণ-ই এই সকল দেশে অধিকতর আদৃত; ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত পুরাণ ও ইতিহাস সেখানে প্রসৃত হইতে পারে নাই।

তথাপি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মী, দেবতা-বাদে উভয়ের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আছে, এবং সেই ঐক্য-হেতু, আমাদের সুপরিচিত অনেক পৌরাণিক কাহিনী চীন ও জাপানের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে পাইয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিন্তু ভারতের পুরাণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত পুরাণ, একেবারে দিগ্‌বিজয় করিয়া সেই দেশের লোকের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে। 'ইন্দোচীন'-নামধেয় ভূ-ভাগে—অর্থাৎ সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ-বর্মা, ব্রহ্মদেশ বা উত্তর- ও মধ্য-বর্মা, দ্বারাবতী বা দক্ষিণ-শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা বা কোচিন্-চীন, এবং শ্যামরাষ্ট্র, এই কয়টী দেশে, এবং 'ইন্দোনেসিয়া' অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতে, অর্থাৎ মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক, বোর্নিও প্রভৃতি স্থানে, ভারতের পুরাণ-কথা এবং রামায়ণ-মহাভারত নব নিকেতন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্মা, শ্যাম ও কম্বোজের লোকেরা এখন বৌদ্ধ ; মালয়, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের লোকেরা এখন মুসলমান ; কেবল ক্ষুদ্র বলিদ্বীপের লোকেরা মিশ্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম পালন করিয়া থাকে। তথাপি ঐ সব স্থানে রামায়ণ, মহাভারত এবং আমাদের বহু পৌরাণিক কাহিনী, ভারতবর্ষের হিন্দুদের কাছে যতটা আদৃত হইয়া থাকে, ততটা-ই আদৃত হইয়া আছে ; এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারতে বোধ হয় ভারত-বর্ষের চেয়েও অধিক আদৃত। ভারতবর্ষের-ই মত ঐ-সব দেশের ভাস্কর্য ও অন্য শিল্পকে আমাদেরই ইতিহাস ও পুরাণ পুষ্ট করিয়াছে—রামায়ণ-মহাভারত বা তদবলম্বনে রচিত নানা কাব্য ও নাটক গ্রন্থ বাদ দিলে, যবদ্বীপীয় ও বলিদ্বীপীয় সাহিত্যের, শ্যাম ও বর্মা ভাষার সাহিত্যের এবং কম্বোজ সাহিত্যের অনেকখানি চলিয়া যায়। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া

আসিয়াছি—আমাদের-ই জাতীয় সম্পদ্ লইয়া সেখানকার লোকেরাও যে এতটা আপনার করিয়া ফেলিয়াছে, এতটা গর্ব করে, তাহা দেখিয়া আমাদের মন গর্ব-সুখে ভরিয়া উঠে। যবদ্বীপের প্রাম্বানান্-এর বিশাল শিবক্ষেত্রের ব্রহ্মা বিষ্ণুর ও শিবের তিনটী বিরাট্ মন্দিরের গাত্রে খোদিত রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ চিত্র ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন; ভারতবর্ষেও এত সুন্দর ও লক্ষণীয় অনুরূপ রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ চিত্রাবলী কুত্রাপি নাই। কম্বোজের সুবিখ্যাত আঙ্কর-বাৎ মন্দিরের ভিত্তিতে-ও তদ্রূপ রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত আছে। রামায়ণ-মহাভারত এবং কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যান এখনও বিশেষ লোকপ্রিয় নাটকের কথাবস্তু; এবং এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া বর্মা, শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের অভিনব ছায়ানাট্য সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আমি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি—এবং যবদ্বীপে আমাদের মহাভারত কি আকারে পাওয়া যায়, সে বিষয়েও সামান্য একটু পরিচয় অন্যত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পুরাণ ও ইতিহাসের আখ্যান ও আদর্শ, যতই অনুশীলন করা যাইবে, দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক তথা শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় সংস্কৃতির পক্ষে ততই মঙ্গল। একটা কথা আমাদিগের ভুলিলে চলিবে না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ যেমন একদিকে জগতের শ্রেষ্ঠতম উপাখ্যানাবলীর অক্ষয় ভাণ্ডার তেমনি অন্যদিকে ভগবদ্জ্ঞান ও ভগবৎপ্রেম এবং চিত্তশুদ্ধির অনুকূল ভাবধারার, তথা ভারতের বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ তপস্যা ও যোগ-সাধনার অনন্ত অমৃত-প্রস্রবণ। পুরাণ ও ইতিহাস আলোচনায় এবং লোক-সমাজে ইহাদের ভূয়ঃ প্রচারে একদেশদর্শী হইলে চলিবে না। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের উপাখ্যানের সহিত শিশু ও কিশোরদিগকে সময়োপযোগী আকারে পরিচিত

করাইবার সাধু চেষ্টা বঙ্গদেশে আজ-কাল দেখা যায়। কিন্তু দেশের সাধারণ ভাব-গতিক দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় যে, পুরাণের অমর উপাখ্যানাবলীকে, ইহার দেবচরিত্র-বিষয়ক কাহিনীগুলিকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভাবশুদ্ধির সহিত আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি যেন বহুক্ষেত্রে আমরা হারাইয়া ফেলিতেছি। পুরাণের আখ্যান কবিত্ব-সৌন্দর্যে ও ভাব-গাম্ভীর্যে অতুলনীয়; আমরা অধুনা যেন সেই আখ্যানগুলিকে কেবল আমাদের aesthetics বা সৌন্দর্য-বোধের উপায়ন-রূপেই ব্যবহার করিয়া, তাহাদের অমর্যাদা করিতেছি। পৌরাণিক আখ্যানের কাব্য-বা চিত্র-সৌন্দর্যেই তাহাদের চরম সার্থকতা নহে; এই আখ্যানগুলি মানুষের গভীরতম সত্তার ও অনুভূতির প্রতীক; এই বোধ—অন্ততঃ পক্ষে—এইরূপ বোধকে জাগরিত করিবার ইচ্ছা, না থাকিলে, পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ আমাদের এই রিক্থের প্রতি অবমাননা করা হয়। পুরাণের অথবা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্বয়ং পরিবর্ধিত না হইলেও রবীন্দ্রনাথের মত কবি, ভগবদ্দত্ত প্রতিভা-বলে ও তাঁহার ঐশী কল্পনাশক্তি-প্রভাবে, আমাদের কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যান, কতকগুলি পৌরাণিক মূর্তির ভাব-সম্পদ্ অনুভূতি-গোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাঁহার অমর কবিতায় অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যের সহিত তাঁহার অনুভূত এই ভাব-সম্পদ্ বঙ্গভাষী পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শিবের মহীয়সী কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথের 'মরণ,' 'পাগল' প্রভৃতি কবিতায় ও গদ্য-রচনায় যে ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার আর তুলনা হয় না। রূপ-কলায় তদ্রূপ সিদ্ধ-শিল্পী নন্দলাল যে-ভাবে পুরাণের মহিমা তাঁহার অমর তুলিকার রেখা-শক্তি ও বর্ণ-সুষমায় ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাও অপূর্ব; তাঁহার নটরাজে, শিবের ও উমার বহু চিত্রে, ও অন্য দেবতা-

বিষয়ক বহু চিত্রে—এবং তাঁহার রামায়ণ-চিত্রাবলীর মত নানা চিত্র-রচনায়—তিনি আমাদের প্রাচীন যুগের বিরাট্ ধ্রুপদ-ছন্দী হিন্দু শিল্পের, মহাবলিপুর-অজণ্টা এলোরা-ধারাপুরীর দেবোচিত সৃষ্টির ঝঙ্কার বা আভাস আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে আনয়ন করিয়াছেন। দৈবী প্রতিভায় ও কল্পনাশক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কতকগুলি কবিতায় যে উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, আস্থাযুক্ত ও শ্রদ্ধাশীল হিন্দুর সাধনার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নন্দলাল আমাদের যে স্বর্গীয় সঙ্গীত তাঁহার তুলিকার রেখা-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-সম্পাতে শুনাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিক-ই বিস্ময়কর। কিন্তু অন্য সাধারণ কবি ও রূপকারের নিকট, পুরাণ ও ইতিহাসের আখ্যানের ভাব-গাম্ভীর্যটুকু যেন ধরা দেয় নাই—মাত্র তাহার কাব্য বা রূপ-সৌন্দর্য-টুকুই ইহাঁরা 'গ্রহণ করিতে' সমর্থ হইয়াছেন। বিগত যুগের কবি ও লেখকদের মধ্যে, বঙ্কিম ও মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীন যেভাবে পুরাণকে নিজ-নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ভাবেই তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা intellect বা ব্যবহারিক বোধ ও বিচার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই করিয়াছিলেন, পুরাণের আভ্যন্তর ভাব-গাম্ভীর্য, অথবা পুরাণ হইতে আহরিত নিছক aestheticism তাঁহাদের প্রেরণা দেয় নাই। ভক্তকবি গিরিশচন্দ্রও পুরাণের আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—তবে পুরাণের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য অপেক্ষা বঙ্গদেশে প্রচলিত ভক্তিবাদই তাঁহার 'পৌরাণিক' নাটকগুলিকে রাগ-রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী যুগের সাধারণ কবি ও লেখকদের কাছে পুরাণ-কথা কাব্য বা কলা-বিলাসের অঙ্গ-মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাব-গাম্ভীর্যের পরিবর্তে, দিব্যানুভূতির দ্যোতনার পরিবর্তে, পুরাণ-কথা ইহাঁদের কাছে ভাববিলাসের বস্তু, রূপ-বিলাসের বা কাব্য-বিলাসের

উপকরণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। জাতির চিত্তে ভাবগ্রাহিণী শক্তির অথবা অনুভূতি-শক্তির এবং চিন্তার গভীরতার হ্রাস হইতে থাকিলে, যথার্থ সৌন্দর্য-বোধের প্রতিষেধক চিত্ত-মালিন্য ঘটিতে থাকিলে, এই রূপটী হয়। প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ ঘটিয়াছিল; আদি ও মধ্য যুগের গ্রীক শিল্প—খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতক পর্যন্ত যে শিল্প রচিত হইয়াছিল—তাহা ভাবশুদ্ধিতে অতুলনীয়; তৎপরবর্তী কালে দেবতার লীলা ও রূপ-শুচিতা, শিল্পের সৌন্দর্য-সৃষ্টির ও কলা-বিলাসের দাসী-মাত্র হইয়া দাঁড়াইল, এবং গ্রীক ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে গ্রীক শিল্পেরও পতন হইল।

আমাদের দেশে এই প্রকারের-ই কলা-বিলাস আসিয়া, কাব্যে ও শিল্পে পুরাণের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে, জাতীয় ভাবশুদ্ধিরও বিনাশ সাধন করিতেছে। আমাদের অধুনাতন ভদ্রসমাজে অনাদৃত যাত্রাগান পুরাণের ভাব মন্দাকিনীকে যথোপযুক্ত রূপে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালাদেশে পুরাণের ধারা এই যাত্রাগানেই নূতন রূপ পাইয়াছে। পুরাণের যেটুকু জ্ঞান এখনও ভদ্র ইতর সকলের মধ্যে বিদ্যমান, সেটুকু যাত্রাগান ও কথকতার মধ্যেই আমরা পাইয়াছি; অধুনা সুচিত্রিত চক্‌চকে' ঝক্‌ঝকে' নানা নয়নাভিরাম পুরাণ কথার পুস্তক সেই সহজ লভ্য জ্ঞানকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। অতি আধুনিক সাহিত্যের মত অতি আধুনিক শিল্প আসিয়া পুরাণের মহিমাকে, হিন্দুর দেব দেবীকে নিত্য অপমানিত করিতেছে; ইউরোপীয় নায়ক নায়িকার প্রেমালাপের আলোক চিত্র ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া, শিল্পিনামধারী আধুনিক অসুরগণ যে ভাবে দেবতার লাঞ্ছনা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া জাতির ভাব জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিদারুণ ভাবে হতাশ হইতে হয়। আর একটী অতি আধুনিক উৎপাত আসিয়া এই ভাব গঙ্গাকে পঙ্কিল করিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেটী হইতেছে সিনেমা। ভগবান্ ইহাদের হাত

হইতে পুরাণকে রক্ষা করুন। জাতির মন হইতে আবার কি করিয়া এই বিলাস বিভ্রান্তিকে দূর করিয়া, তাহার স্থানে যে ভাবশুদ্ধি, যে চিত্তস্থৈর্য ও যে যথার্থ সৌন্দর্যবোধ এতদিন ধরিয়া হিন্দুর সহজ সম্পত্তি ছিল তাহাকে ফিরাইয়া আনা যায়, তদ্বিষয়ে আমাদের সমাজ নেতৃগণের হিন্দুর চিত্তগতির নিয়ন্তৃগণের আশু অবহিত হওয়া আবশ্যক।

আমার মনে হয়, পুরাণ যে কেবল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার নহে, গভীর চিন্তারও ভাণ্ডার বটে, এইরূপ শিক্ষা সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক—বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই যে, রায় বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্কলিত 'ভাগবত কুসুমাঞ্জলি'র মত পুরাণ হইতে আধ্যাত্মিক সাধন সম্বন্ধীয় সূক্তি-চয়নময় পুস্তকের বিশেষ উপযোগিতা আছে। এবং ওসব থর্‌রামের অনুবাদের বাহুল্য যখন চোখে নিতান্ত-ই লাগে, তখন মনে হয়, দক্ষিণ-ভারতের তামিল শৈব সাধক মাণিক্যবাচকর্ ও তয়ুমানববর প্রভৃতির, এবং দক্ষিণের বৈষ্ণব সাধক আল্‌বার্‌গণের পৌরাণিক দেব-প্রতীকের মাধ্যম অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার বাণী আমাদের দেশে পহুঁছানো আবশ্যক। এইরূপ পুরাণ সংগ্রহ ও তিরুবাচকম্, নালায়ির-প্রবন্ধম প্রভৃতি পুস্তক হইতে অনুবাদ হাতে পড়িলে-ই, সদ্‌ভাব-যুক্ত তরুণ-তরুণীকে চিত্তস্থৈর্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অবহিত করিবে, গভীর বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য দৈববাণীর মত আহ্বান করিবে,—এবং আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবী, যাঁহাদের আমরা কেবল রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রশালায় রক্ষা করিয়া জীবন হইতে নির্বাসিত করিতেছি, তাঁহাদের আবার হৃদয়-মধ্যে গ্রহণ করিয়া, এ যুগের মানুষ যে আমরা, আমরাও ধন্য হইব।

বঙ্গীয়-পুরাণ-পরিষৎ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ে

জ্ঞান-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণকর কার্য করিতেছেন। পুরাণের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য সাধারণ বাঙ্গালী তরুণ-তরুণী তথা বয়োবৃদ্ধগণকে ইঁহারা সুন্দর-ভাবে সময়োপযোগী পদ্ধতিতেই আহ্বান করিতেছেন। "হরি-ভেটন, দধি-বেচন, এক পন্থ দৈ কাজ"—পুরাণের সঙ্গে পরিচয়, ও সঙ্গে-সঙ্গে মাতৃ-ভাষায় একাধিক শ্রেষ্ঠ সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মাতৃভাষা শিক্ষার দিকে প্ররোচনা—এই দুইটী জিনিস যুগপৎ ইঁহারা দেশের ছেলে-মেয়েদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছেন। পরীক্ষান্তে অর্জিত প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক উপাধি লাভের আশা এই পরীক্ষার্থীদিগকে অতি সাধু উপায়ে এই সৎকার্যে প্রণোদিত করিতেছে। আমার মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পুরাণ পরিষদের প্রবর্তিত এই কার্যের আরও প্রচার হওয়া আবশ্যক। উত্তর ভারতে হিন্দী ভাষায় তিনটী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, হিন্দী সাহিত্যের চর্চা ও তাহার প্রচারের পথ অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছেন। সম্মেলনের এই পরীক্ষাগুলি যথার্থই পরীক্ষা-পদ-বাচ্য, পরীক্ষার্থীদিগের যোগ্যতার বিচার, উচ্চ আদর্শ অনুসারে যথোচিত নিরপেক্ষতার সহিত হয় বলিয়া, সম্মেলনের উপাধি-প্রাপ্ত নর-নারী হিন্দী জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এরূপ পরীক্ষার প্রবর্তন করুন, এতদ্বিষয়ে বহুদিন ধরিয়া আমি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছি। এখন দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছি যে বঙ্গীয়-পুরাণ-পরিষৎ আংশিক ভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরই কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, পুরাণ পরিষদের দ্বারা গৃহীত এই গুরুতর কার্যভার লাঘব করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে ও বঙ্গভাষী জাতির

নিকট হইতে সহানুভূতি ও সহায়তা আসুক, পুরাণ পরিষদের কার্যের ক্ষেত্র উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করুক, এবং জাতির সংরক্ষণ ও সংগঠন কার্যে পরিষদের আরব্ধ চেষ্টা পূর্ণ হউক, পরিষদ্ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করুন।

আজিকার সভায় উপস্থিত উত্তীর্ণ ও উপাধি-প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের দুইটী কথা নিবেদন করিয়া আমার অভিভাষণের উপসংহার করিব। আপনারা এই পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসার কার্য করিয়াছেন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন,—তজ্জন্য প্রথমতঃ আপনাদের অভিনন্দিত করিতে চাহি। সাধারণ শিক্ষার উপরন্তু আপনারা যে মাতৃভাষার প্রতি এবং আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছেন,—শ্রম স্বীকার করিয়া যে পাঠ্যগুলির অধ্যয়ন করিয়াছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় যে প্রতিষ্ঠা আপনারা পাইলেন, তাহা এই অনুরাগের ও শ্রম-স্বীকারের পূর্ণ পারিতোষিক নহে। ব্রত-গ্রহণ ও ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য আত্মপ্রসাদ এবং সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ-জনিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক লাভই এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও চিরস্থায়ী পারিতোষিক। যাঁহারা আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আশা করি তাঁহারা যথাকালে মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দিবেন। যাঁহারা আজ উপাধি পরীক্ষায় সাফল্যের নিদর্শন-স্বরূপ 'ভারতী' অথবা 'পুরাণ-রত্ন উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা যেন এই উপাধি-লাভেই আরব্ধ পুরাণ-চর্চার পরিসমাপ্তি না করেন। পুরাণ ও ইতিহাস, ও তৎসম্পর্কে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও চর্যা সম্বন্ধে উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধি করা, এবং এই বিষয়ে দেশের লোকদের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করা তাঁহাদের জীবনের অন্যতম ব্রত হউক। এই পরীক্ষা দেওন দ্বারা যদি তাঁহারা পাঠ হেতু, অথবা উত্তীর্ণ হওয়ার

আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠালাভ হেতু, নিজেদের স্বল্প পরিমাণেও উপকৃত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্তব্য হইবে, তাঁহাদের পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে এই পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত তরুণ-তরুণী বা অন্য ব্যক্তিকে পুরাণের দিকে আকৃষ্ট করা। নিজেদের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত তো হইবেন-ই, পুরাণ-প্রচার-কল্পে যেখানে সুবিধা হইবে—কথকতা, কীর্তন, রামায়ণ-গান, মনসার-গান, যাত্রা প্রভৃতি ধার্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য সদা অবহিত থাকিবেন। বহু বিষয়ে আমরা পিতৃ-পুরুষগণের নিকটে ঋণী; পুরাণ-প্রচার, পুরাণের পঠন-পাঠন, শ্রবণ শ্রাবণ এই ঋণ শোধ করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। ইহার দ্বারা পিতৃ-ঋণের আংশিক ভাবে পরিশোধ হইবে; এবং প্রকৃত লোক-শিক্ষার সহায়তা করিয়া দেশবাসিগণের-ও যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিবার সৌভাগ্য আপনারা প্রাপ্ত হইবেন। আপনাদের উপস্থিত সাফল্যের জন্য ও ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের জন্য আমার সাদর অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভকামনা নিবেদন করিতেছি।*



*শান্তিপুর বঙ্গীয়-পুরাণ-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, শারদীয়া ত্রয়োদশী (২৬ শে আশ্বিন ১৩৩৯)॥